দ্য ম্যান হু কাউন্টেড

এক গাণিতিক অভিযাত্রার কাহিনি

মূল: মালবা তাহান

অনুবাদ: আব্দুল্যাহ আদিল মাহমুদ

উৎসর্গ

লেখক পরিচিতি

মালবা তাহান

মালবা তাহান ব্রাজিলীয় গণিত লেখক হুলিও সিজার দা মেইয়ো এ সৌজার (১৮৯৫-১৯৭৪) ছদ্মনাম। হুলিও সিজার এই নামটি ব্যবহার করেই তাঁর অসাধারণ লেখাগুলোর বেশিরভাগ লিখেছেন।

হুলিও সিজার গণিতের অধ্যাপক। লিখেছেন ৬৯টি গল্পের বই ও ৫১টি গণিত ও অন্যান্য বিষয়ের বই। একজন জীবনীকার তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন, “একমাত্র গণিত শিক্ষক যিনি ফুটবল খেলোয়ারদের সমান জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন।“ দ্য আলকেমিস্টের লেখক পাওলো কোয়েলহো তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, “অ্যা গ্রেট স্টোরিটেলার।“

অসাধারণ বইগুলোর জন্য তিনি ব্রাজিলিয়ান লিটারেরি একাডেমীর মর্যাদাজনন পুরস্কার পেয়েছেন। ২০০৪ সালে তাঁর ছদ্মনাম দিয়ে তৈরি করা হয় দ্য মালবা তাহান ইনস্টিটিউট। তাঁর প্রতি সম্মান দেখিয়ে রিও ডি জানেইরোর সংসদ ঠিক করে তাঁর মৃত্যদিন ৬ মে দেশে গণিত দিবস হিসেবে পালিত হবে।

*দ্য ম্যান হু কাউন্টেড* তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত বই। ২০০১ সালেই বইটির ৫৪তম মুদ্রণ প্রকাশিত হয়।

অনুবাদক পরিচিতি

আব্দুল্যাহ আদিল মাহমুদ

পাবনা ক্যাডেট কলেজে পরিসংখ্যান বিভাগের প্রভাষক হিসেবে কর্মরত। এর আগে রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করেছেন ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যান্ড অ্যাডভাইজরস লিমিটেড (EAL) প্রতিষ্ঠানে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগ থেকে অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেছেন।

লেখালেখির সূচনা গণিত ম্যাগাজিন পাই জিরো টু ইনফিনিটির মাধ্যমে। কন্ট্রিবিউটর হিসেবে কাজ করেছেন প্রথম আলো পরিবারের মাসিক বিজ্ঞান ম্যাগাজিন বিজ্ঞানচিন্তায়। কিশোরআলো, ব্যাপনসহ বিভিন্ন ম্যাগাজিনে নিয়মিত লিখছেন গণিত, পরিসংখ্যান ও জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে। এছাড়া বিজ্ঞান বিষয়ে অনলাইনেও সক্রিয়ভাবে লেখালেখি করছেন।

বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞানকে জনপ্রিয়করণ ও সহজে উপস্থাপন করার জন্যে তৈরি করেছেন অনলাইন পোর্টাল বিশ্ব ডট কম (sky.bishwo.com)। একই উদ্দেশ্যে পরিসংখ্যান ও ডেটা সায়েন্স নিয়ে তৈরি করেছেন Stat Mania (www.statmania.info)।

**প্রিয় শখ**: নতুন কিছু শেখা (বিশেষ করে গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞান), প্রোগ্রামিং, ভ্রমণ ও রাতের আকাশ পর্যবেক্ষণ।

**পৈত্রিক নিবাস**: লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার ঝাউডগী গ্রাম।

লেখকের অনান্য বই

* অ্যা ব্রিফার হিস্ট্রি অব টাইম (২০১৭) (অনুবাদ, মূল স্টিফেক হকিং ও লিওনার্দ ম্লোডিনো)
* মহাবিশ্বের সীমানা (২০১৯)
* অসীম সমীকরণ (২০১৯)
* চন্দ্রজয়ের ৫০ বছর (২০২০) (প্রথিতযশা কয়েকজন লেখকের সাথে যৌথভাবে)
* দ্যা লাস্ট থ্রি মিনিটস (২০২১)

**ইমেইল**: almahmud.sbi@gmail.com

**ওয়েবসাইট**: www.thinkermahmud.com

**ফেসবুক**: mahmud.sbi

বই পরিচিতি

এক নজর দেখেই কি আকাশের শত শত পাখির ঝাঁকে ঠিক কয়টি পাখি আছে তা বলা সম্ভব? সম্ভব শুধু চারটি ৪ ব্যবহার করে সবগুলো সংখ্যা তৈরি করা? কিংবা ৩৫টি উটকে তিন দিয়ে নিঃশেষে ভাগ করা? ৫০টি ও ৩০টি আপেল একই দামে বিক্রি করে সমান লাভ পাওয়া? কিংবা কবিতার লাইনে সংখ্যার বন্ধুত্ব ফুটিয়ে তোলার রহস্য উন্মোচন? প্রথম দেখায় এগুলোর কোনোটিই সহজ নয়। কিন্তু ইরানি গণিতবিদ বেরেমিজ সামির তাই করেছেন অবলীলায়।

বইটি হানাক তাদে মাইয়ার ভাষণে বর্ণিত হয়েছে। বাগদাদের বাসিন্দা। এক সফরে তিনি পাগলাটে এক লোকের দেখা পান। লোকটি আপনমনে কী যেন গুনছে। জানা গেল, সেই লোক, বেরেমিজ সামির, এক অসাধারণ প্রতিভাধর গণিতবিদ। এরপর থেকে গণিতবিদের সাথেই সময় কাটে হানাকের। দুজনে বাগদাদে পৌঁছেন। চাকরি পান খলিফার দরবারে।

যাওয়ার পথে ও বাগদাদে পৌঁছে বেরেমিজ বাস্তব ও জটিল সব গাণিতিক সমস্যার সমাধান করেন। আর সেসবের কাহিনি হানাক আমাদের শোনান অপূর্ব উপস্থাপনায়। কথায় কথা উঠে এসেছে গণিতের ইতিহাসও। আছে ভারতীয় ও হিন্দু গণিতবিদদের কথা। আছে নারী গণিতবিদদের কথা।

বইটি পড়লে একদিকে যেমন বাস্তব সমস্যা সমাধানে গণিতের দারুণ সব ব্যবহার পাওয়া যাবে, তেমনি পাওয়া যাবে আব্বাসীয় খিলাফতের সময়কালের বাগদাদের দারুণ এক বিবরণ। সেসময় মানুষে-মানুষে পারস্পরিক সম্পর্ক কেমন ছিল, কেমন ছিল হাট-বাজার, কেমন ছিল ঘরবাড়ি ইত্যাদি বর্ণনাগুলো দারুণভাবে উঠে এসেছে গণিতের গল্পের ফাঁকে ফাঁকে।

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু

০১। মেধার সাক্ষাৎ

০২। যার ওপর আস্থা রাখা যায়

ভূমিকা

০১

মেধার মিলন

পরম করুণাময় আল্লাহর নামে।

আমার নাম হানাক তাদে মাইয়া। একবার বাগদাদের রাস্তা ধরে উটের পিঠে করে বাড়ি ফিরছিলাম ধীরগতিতে। এতদিন টাইগ্রিস নদীর তীরের সামারা শহর ঘুরে বেড়িয়েছি। হঠাৎ দেখালাম, ভদ্র পোশাকের একজন মুসাফির একটি পাথরের ওপর বসা। ভ্রমণের ক্লান্তির ছাপ চোখে-মুখে।

স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে তাকে সালাম দিতে যাচ্ছিলাম। আমাকে অবাক করে দিয়ে তিনি দাঁড়িয়ে তিনি মন্ত্রোচ্চারণের ভঙ্গিতে বলে উঠলেন, “চৌদ্দ লক্ষ তেইশ হাজার সাত শ পয়তাল্লিশ।“ এরপর দ্রুত করে বসে পড়ে নিরব হয়ে গেলেন। দুই হাতের ওপর মাথা রেখে গভীর ভাবনায় ডুবে গেলেন। থেমে একটু দূরে দাঁড়িয়ে তাকে দেখতে লাগলাম। তাকে মনে হচ্ছিল অতীতের রূপকথার গল্প থেকে উঠে ঐতিহাসিক কোনো ব্যক্তির ভাস্কর্য।

একটু পর আবার দাঁড়ালেন। পরিষ্কার ভাষায় সযত্নে আরেকটি বিশাল সংখ্যা আওড়ালেন, “তেইশ লক্ষ একুশ হাজার আট শ ছেষট্টি।“

আরও কয়েকবার দাঁড়িয়ে লোকটা এমন কিছু সংখ্যা উচ্চারণ করলেন। আবারও রাস্তার পাশের রুক্ষ পথরটার উপর বসলেন তিনি। কৌতূহল দমন করতে না পেরে আমি তার কাছে গেলাম। সালাম দিয়ে সংখ্যাগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম।

“হে আগন্তুক,” গণনাকারী বললেন, “আমার চিন্তা-ভাবনা ও হিসাবের অসুবিধা হলেও আপানার কৌতূহলকে এড়িয়ে যাব না। আপনি আমার সাথে সৌজন্য ও ভদ্রতার সাথে কথা বলেছেন। আপনার ইচ্ছা পূরণ করছি। তবে আগে আপনাকে আমার নিজের কাহিনি বলতে হয়।“

এরপর তিনি আমাকে নিজের কাহিনি শোনালেন। মজার গল্পটা আমি তাঁর কণ্ঠেই শোনাচ্ছি আপনাদের।

০২

যার ওপর আস্থা রাখা যায়

**এ অধ্যায়ে**

গণনাকারী তাঁর জীবনের গল্প শোনাচ্ছেন। জানলাম তাঁর হিসাব করার বিস্ময়কর ক্ষমতার কথা। জানতে পারবেন কীভাবে আমরা একে অপরের সফরসঙ্গী হলাম।

আমার নাম বেরেমিজ সামির। পারস্যের খোই গ্রামে আমার জন্ম। পিরামিডের মতো দেখতে সুউচ্চ আরারাত পর্বতের ছায়ায় গ্রামটির অবস্থান। খুব ছোট থাকতেই আমি রাখালের কাজ শুরু করি। আমার মনিব ছিলেন খামাত অঞ্চলের একজন বিত্তশালী মানুষ।

“প্রতিদিন ভোরের আলো ফুটলেই আমি বিশাল এক ভেড়ার পাল নিয়ে তৃণভূমিতে চলে যেতাম। আলো ফুরাবার আগেই আমাকে ফিরে আসতে হত। কোনো ভেড়া হারিয়ে গেলে কঠোর শাস্তির ভয় ছিল। এ ভয়ে আমি প্রতিদিন কয়েকবার সেগুলো গুণতাম।

“গণনায় আমি খুব দক্ষ হয়ে গেলাম। মাঝে মাঝে তো এক নজর দেখেই পুরো পাল গুণে ফেলতে পারতাম। গণনার চর্চার জন্যে আমি আকাশে ওড়া পাখির ঝাঁক গুণতাম। ক্রমেই এই শিল্পে আমি কুশলী হয়ে উঠতে থাকলাম। আমি পিঁপড়া ও অন্যান্য পোকামাকড় গুণতে থাকলাম। কয়েক মাস পরে দারুণ এক অর্জন হয়ে গেল আমার। একটি মৌছাকের সব মৌমাছি গুণে ফেললাম আমি। এই কৃতিত্ব অবশ্য আমার পরের অর্জনগুলোর তুলনায় কিছুই নয়।

“কিছুটা দূরের অঞ্চলে আমার সহৃদয় মনিবের কিছু মরুদ্যান ছিল। যেখানে ছিল সুবিশাল খেজুর বৃক্ষসারি। আমার গাণিতিক প্রতিভার কথা মনিব জেনেছিলেন। এবার তিনি আমাকে খেজুর বিক্রির দায়িত্ব দিলেন। সেগুলোকে গুচ্ছে গুচ্ছে একটি একটি করে গুণতাম আমি। এভাবে খেজুর গাছের তলায় আমার দশ বছর কাটল। মনিবের প্রচুর লাভ হলো। খুশি হয়ে তিনি আমাকে চার মাসের অবকাশ দিলেন। এখন আমি বাগদাদ যাচ্ছি। সেখান আমার পরিবারের সাথে সাক্ষাৎ করব। আর দেখব সেখানকার সুন্দর সুন্দর মসজিদ ও জাঁকজমকপূর্ণ প্রাসাদগুলো।

“সময় নষ্টের হাত থেকে বাঁচতে আমি ভ্রমণ করতে করতে এই অঞ্চলের খেজুর গাছগুলো গুণেছি। গুণেছি সেই ফুলগুলো যেগুলোর ঘ্রাণে এই পথ বিমোহিত হয়ে আছে। সে পাখিগুলো যেগুলো মেঘের ফাঁকে ফাঁকে পাখা মেলে উড়ছে। “

কাছের একটি ডুমুর গাছ দেখিয়ে তিনি বললেন, “এই যেমন এই গাছটির কথাই ধরুন। এতে দুই শ চুরাশিটি ডাল আছে। প্রতি ডালে গড়ে তিন শ সাতচল্লিশটি পাতা থাকলে, সহজেই হিসাব করা যায়, এতে মোট আটানব্বই হাজার পাঁচ শ আটচল্লিশটি পাতা আছে। তাই না, বন্ধু?”

“অসাধারণ!” আমার কণ্ঠে বিস্ময়। “এটা সত্যিই অবিশ্বাস্য যে একজন মানুষ একটি গাছের দিকে এক নজর তাকিয়ে সবগুলো ডালের সংখ্যা বলতে পারে। বাগানের সব ফুলের সংখ্যা বলতে পারে। এই প্রতিভা কাজে লাগিয়ে যে কেউই অনেক টাকার মালিক হতে পারে।“

“আপনার কি তাই মনে হয়?” বেরেমিজ বললেন। “আমার কখনও মনে হয়নি, লক্ষ পাতা ও মৌমাছি গুণে অর্থ পাওয়া যেতে পারে। একটি গাছে কয়টি ডাল আছে তা কার কী কাজে লাগবে? আকাশের একটি পাখির ঝাঁকে কয়টি খেচর উড়ছে তাই বা কে টাকা দিয়ে জানতে চাইবে?”

“আপনার বিস্ময়কর প্রতিভা,” আমি ব্যাখ্যা করলাম, “কুড়িটা আলাদা উপায়ে কাজে লাগানো সম্ভব। কনস্টান্টিনোপাল বা এমনকি বাগদাদের মতো বিশাল রাজধানীতে আপনি সরকারকে অপরিসীম সহায়তা করতে পারেন। আপনি মানুষ, সেনাবাহিনি ও পশুর পাল গুণতে পারবেন। দেশের সম্পদের হিসাব করা আপনার জন্যে সহজ। দেশের উৎপাদন, কর, পণ্য ও দেশের সব অর্থের হিসাব-নিকাশ আপনি করে ফেলতে পারবেন। আমার বাড়ি বাগদাদে। সে সুবাদে আমি আমার পরিচিতি কাজে লাগিয়ে আমি আমাদের শাসক ও মনিব খলিফা আল-মুতাসিমের দরবারে আপনার জন্যে কোনো পদের ব্যবস্থা করে ফেলার আস্থা দিতে পারি। আপনি কোষাধ্যক্ষ হতে পারেন। অথবা মুসলমানদের পারিবারিক বিষয়ের সচিবের দায়িত্ব পালন করতে পারেন।“

“ঠিক আছে, আমি তাহলে সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেললাম।“ বললেন গণনাকারী। “আমি বাগদাদেই যাচ্ছি।“

আর কথা না বাড়িয়ে তিনি আমার পেছনে উটে উঠে বসলেন। একমাত্র উটের পিটে চেপে আমরা অপূর্ব সুন্দর বাগদাদ শহরের দিকে এগিয়ে চলছি। গাঁয়ের পথে হঠাৎ সাক্ষাৎ ঘটা সেই লোক সেই থেকে হয়ে গেলেন আমার বন্ধু ও সর্বক্ষণের সঙ্গী।

বেরেমিজ খুব হাসিখুশী মানুষ। কথা বলেন খুব। বয়সটা বেশি নয় (তখনও ছাব্বিশ পূর্ণ হয়নি)। তিনি ছিলেন প্রানোচ্ছ্বল বুদ্ধিমত্তার আশির্বাদপুষ্ট। ছিল সংখ্যার বৈশিষ্ট্য জানার ছিল দুর্বার নেশা। খুব সাদামাটা ঘটনা থেকেও তিনি অন্যদের জন্যে অসম্ভব তুলনা বের করে আনেন। যা তাঁর গাণিতিক বিচক্ষণতার পরিচায়ক। তিনি গল্প ও কাহিনি বলতেও পারদর্শী। সেজন্যে তাঁর কথাবার্তা শুনতে অদ্ভুত হলেও আকর্ষণীয়।

কখনও কখনও তিনি কয়েক ঘণ্টা চুপ হয়ে বসে থাকতেন। একটুও শব্দ করতেন না। মনে মনে কিন্তু চলছে কড়া হিসাব-নিকাশ। এ সময়গুলোতে আমার কষ্ট হলেও তাকে বিরক্ত করতাম না। তাঁকে শান্তিতে থাকতে দিতাম। হয়ত ঐ সময়েই এই মেধাবী মনন থেকে বেরিয়ে আসবে গণিতের প্রাচীন কোনো রহস্যের অপূর্ব আবিষ্কার। যে বিজ্ঞানকে আরবরা উন্নত করেছে ও তাতে নতুন অবদান যোগ করেছে।

০৩

বোঝাবাহী পশু

**এ অধ্যায়ে**

৩৫টি উট বন্টনের কাহিনি, যেগুলোকে তিন আরব ভাইয়ের মধ্যে ভাগ করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। যেভাবে গণনাকারী বেরেমিজ সামির আপাত দৃষ্টিতে অসম্ভব সেই ভাগটি করলেন, যার ফলে তর্করত তিন ভাই সন্তুষ্ট হয়ে গেল। যেভাবে এর ফলে আমাদেরও লাভ হলো।

একটানা কয়েক ঘণ্টা চললাম আমরা। হঠাৎ করে বলার মতো একটা ঘটনা ঘটল। আমার সহযাত্রী বেরেমিজ এবার দক্ষ বীজগাণিতিকের মতো তাঁর মেধার প্রতিফলন দেখালেন।

একটি পুরনো ও অর্ধ-পরিত্যক্ত সরাইখানার কাছে তিনজন মানুষকে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় করতে দেখলাম। পাশেই কতগুলো উট দাঁড়িয়ে আছে। রাগে তিনজনের মুখ লাল হয়ে আছে। শোনা গেল তাদের কথা:

“না, তা হতে পারে না।“

“এ তো ডাকাতি!”

“কিন্তু আমি তো রাজি নই তাতে!”

বুদ্ধিমান বেরেমিজ তাদেরকে তর্কের কারণ জিজ্ঞেস করলেন।

“আমরা তিনজন সহোদর।“ বড়জন বলল। “উত্তরাধিকার সূত্র ৩৫টি উট পেয়েছি আমরা। বাবার ইচ্ছা অনুসারে এগুলোর অর্ধেক পাব আমি। তিন ভাগের এক ভাগ পাবে আমার ভাই হামিদ। আর নয় ভাগের এক ভাগ পাবে ছোট ভাই হারিম। কিন্তু আমরা ভাগটা করতে পারছি না। কেউ কিছু বললেই বাকি দুজন প্রতিবাদ করে। এ পর্যন্ত যত সমধান এসেছে তার কোনোটাই গ্রহণযোগ্য হয়নি। ৩৫-এর অর্ধেক ১৭.৫। তিন ভাগ বা নয় ভাগের একভাগও তো ভাল কোনো সংখ্যা নয়। তাহলে কীভাবে ভাগ হবে?”

“খুব সোজা,” বললেন গণনাকারী। “আমি সঠিকভাবে ভাগ করে দিচ্ছি। তোমাদের ৩৫টি উটের সাথে আমার সুদর্শন উটটিও যোগ করলাম।“

কিন্তু আমি বাধ সাধলাম, “এমন পাগলামি আমি মানি না। উট ছাড়া আমরা সফর করব কীভাবে?”

“চিন্তা করো না, বাগদাদের বন্ধু,” বেরেমিজ কানে কানে বলল, “আমি যা করছি জেনে-বুঝেই করছি। তোমার উটটা দাও। দেখোই না কী করি।“

তাঁর কথার আত্মবিশ্বাসের স্ফুরণ দেখে আমি আর দ্বিধা না করে আমার সুন্দর উটটি তাঁকে দিয়ে দিলাম। এবার একে তিন ভাইয়ের উটের সাথে যোগ করা হলো।

“বন্ধুগণ,” তিনি বললেন, “আমি একটি ন্যায় বণ্টন ও সঠিক বিভাজন করব। এখন আমাদের কাছে উট আছে ৩৬টি।“

বড় ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, “আপনার উট পাওয়ার কথা ৩৫-এর অর্ধেকসংখ্যক। মানে ১৭.৫। আমি আপনাকে দেব ১৮টি। এতে আপনার আপত্তি করার কিছুই নেই, কারণ আপনি প্রাপ্যের চেয়ে বেশিই পাচ্ছেন। “

দ্বিতীয় ভাইকে তিনি বললেন, “হামিদ, আপনার পাওয়ার কথা ৩৫-এর তিন ভাগের এক ভাগ। মানে ১১টির ভগাংশ পরিমাণ বেশি। এখন আপনি পাবেন ১২টি। আপনার কিছু বলার কথা নয়, আক্রণ আপনি বেশিই পেয়েছেন।“

এবার তিনি ছোটভাইয়ের দিকে ঘুরলেন, “হারিম নামির, আপনার বাবার ইচ্ছা অনুসারে আপনি পাচ্ছেন ৩৫-এর নয় ভাগের এক ভাগ, যাতে ৩টা ও আরেকটার কিছু অংশ হয়। কিন্তু আমি পুরো ৪টি উট দিলাম। আপনিও প্রাপ্যের চেয়ে বেশিই পেয়েছেন বলে আমাকে ধন্যবাদ দিতে পারেন।“

এবার তিনি বলে গেলেন, “আমার বণ্টনে সবাই লাভবান হয়েছেন। বড় ভাই পেছেন ১৮টি উট, পরের ভাই পেয়েছেন ১২টি, আর ছোটভাই ৪টি। ১৮ + ১২ + ৪ = ৩৪টি উট বণ্টন হয়েছে। ২টি উট বাকি থাকল। এর একটি আমাদের বাগদাদী বন্ধুর উট। আমি সমস্যাটি সমাধান করে দিয়েছি বলে আরেকটি উট আমাকে দিতে পারেন চাইলে।“

“হে আগন্তুক, আপনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান একজন মানুষ।“ বড় ভাইর কণ্ঠে প্রশংসা। “আমরা বিশ্বাস করি, সঠিক ও ন্যায়ভিত্তিক বণ্টনই হয়েছে। আমরা আপনার সমাধান গ্রহণ করলাম।“

বুদ্ধিমান গণনাকারী বেরেমিজ পাল থেকে ভাল একটু উট নিলেন। আমার উটের লাগাম তুলে দিলেন আমার হাতে। বললেন, “বন্ধু, চলো, আরাম ও তৃপ্তির সাথে যাত্রা শুরু করি। এখন আমার কাছেও উট আছে।“

আমরা বাগদাদের উদ্দেশ্যে চলতে লাগলাম।

০৪

চিন্তার জন্যে খাবার

**এ অধ্যায়ে**

এক ধনী শেখের সাথে আমাদের সাক্ষাৎ ঘটল। আমাদের আট টুকরো রুটি সম্পর্কে সে যে প্রস্তাব দিল। আমাদের পাওয়া আটটি মুদ্রার বণ্টন যে সুন্দরভাবে সম্পন্ন হলো। বেরেমিজের তিন ধরনের ভাগ পদ্ধতি: সরল, প্রকৃত ও নিখুঁত বিভাজন। গণনাকারীর প্রতি মহান উজিরের প্রশংসা।

তিন দিন পরের কথা। আমরা সিপ্পুর নামে ছোট একটি ধ্বংসপ্রায় গ্রামের কাছাকাছি হলাম। দেখলাম, হাত-পা মাটিয়ে ছড়িয়ে একজন উসাফির বসা। জামা-কাপড় ছেঁড়া-ফাটা। গায়ে ভাল আঘাতও আছে। অবস্থা খুব নাজুক। হতভাগ্য মানুষটার দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলাম আমরা। তিনি পরে আমাদেরকে তার দূর্ভাগ্যের গল্প শোনালেন।

তার নাম সালিম নাসির। বাগদাদের অন্যতম বিত্তশালী বণিক। কয়েক দিন আগে বসরা থেকে আল-হিল্লাহ যাওয়ার পথে পারসিক মরু ডাকাত তার কাফেলাকে হামলা ও লুট করে। প্রায় সবাই তাদের হাতে মারা পড়েছে। তিনি ছিলেন কাফেলার নেতা। বালুর মধ্যে অন্যান্য লাশের মধ্যে লুকিয়ে তিনি অলৌকিকভাবে বেঁচে যান।

দুঃখের কাহিনি শেষ করে কাঁপাকাঁপা স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, “আপনাদের কাছে কি খাওয়ার কিছু হবে? আমি খিদেয় মরে যাচ্ছি।“

“আমার কাছে রুটির তিনটে টুকরো আছে।“ আমি উত্তর দিলাম।

“আমার কাছে আছে পাঁছটা।“ বলেন গণনাকারী।

“খুব ভাল,” বললেন শেখ। “আমাকে একটু দেওয়া যাবে কি? আমি এর প্রতিদান দেব আপনাদেরকে। বাগদাদে পৌঁছলে আমি রুটির বদলে আট টুকরো স্বর্ণ দেব।“

আমরা তাই করলাম।

পরের দিন পড়ন্ত বিকেলে আমরা প্রাচ্যের মুক্তো, বিখ্যাত বাগদাদ শহরে প্রবেশ করলাম। কর্মব্যস্ত চত্বর পার হতেই সুন্দর পোশাকের একদল মানুষ আমাদের সামনে পড়ল। অভিজাত পিঙ্গল বর্ণের এক ঘোড়ায় চেপে তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন অন্যতম ক্ষমতাশালী উজির ইব্রাহিম মালুফ। আমাদের সাথে শেখ সালিম নাসিরকে দেখে তিনি বহর থামালেন। শেখকে বললেন, “কী হয়েছে তোমার, বন্ধু?” কেন তুমি ছিন্ন পোশাকে দুই আগন্তুকের সাথে বাগদাদে এসেছ?”

হতভাগা শেখ ভ্রমণের আদ্যোপান্ত তুলে ধরলেন। আমাদের প্রশংসা করলেন পঞ্চমুখে।

“এখনই এদের দাম দিয়ে দাও, “উজির নির্দেশ দিলেন। পকেট থেকে আটটি স্বর্ণমুদ্রা বের করে সালিম নাসিরকে দিলেন। তাকে বললেন, “আমি এক্ষুণি তোমাকে দরবারে নিয়ে যাব। বিশ্বাসীদের রক্ষক নতুন এই মরু ডাকাতদের কথা অবশ্যই জানতে চাইবেন, যারা খলিফা এলাকার ভেতরেই আমাদের বন্ধুদের আক্রমণ করে মালামাল লুটে নেয়।“

এরপর সালিম নাসির বললেন, “বন্ধুগণ, তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি তাহলে। তোমাদের সাহায্যের জন্যে আবারও ধন্যবাদ। আর হ্যাঁ, প্রতিশ্রুতি অনুসারে তোমাদের মূল্য দিতে চাই।“

গণনাকারীর দিকে তাকিয়ে বললেন, “এই নাও তোমার পাঁচ স্বর্ণমুদ্রা, পাঁচ টুকরো রুটির জন্য।“

“আর হে বাগদাদের বন্ধু, এই নাও তোমার তিনটি স্বর্ণমুদ্রা।“ বললেন আমাকে।

আমাকে অবাক করে দিয়ে গণনাকারী সশ্রদ্ধ আপত্তি জানালেন। “মাফ করবেন, শেখ, এই বণ্টনকে দেখে সরল মনে হলেও গাণিতিকভাবে ভুল। আমি পাঁচ টুকরো রুটি দিয়েছে হিসেবে সাতটি স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া উচিত। আমার বন্ধু, যে তিনটি টুকরো দিয়েছে, তার পাওয়া উচিত একটি স্বর্ণমুদ্রা।“

“বলো কী!” উজিরও আকাশ থেকে পড়লেন। কৌতূহলভরে প্রশ্ন করলেন, “এমন অদ্ভুত ভাগের পেছনে কী যুক্তি থাকতে পারে?”

গণনাকারী মন্ত্রীর কাছাকাছি হলেন। বললেন:

“জি, আমি দেখাচ্ছি। আমার কথা গাণিতিকভাবে সঠিক। সফরের সময় আমাদের খিদা লাগলে আমি এক টুকরো রুটি নিলাম। একে তিন ভাগ করে সবাই এক ভাগ করে খেলাম। এভাবে আমার পাঁচটি টুকরো পনের খণ্ড হলো, ঠিক? আমার বন্ধুর তিন টুকরো হলো নয় খণ্ড। মোট খণ্ড হলো চব্বিশটি। আমার পনের খণ্ড থেকে আমি খেয়েছি আট খণ্ড। ফলে আমি আসলে দান করেছি সাত খণ্ড। আমার বন্ধুও খেয়েছে আট খণ্ড। আর দান করেছে নয় খণ্ড। ফলে সে আসলে দান করেছে এক খণ্ড। আমার দান করা সাত খণ্ড আর আমার বন্ধুর এক খণ্ড নিয়ে মোট আট খন্ড খেলেন শেখ। অতএব ন্যায়সঙ্গত বণ্টন এটাই যে আমি পাব সাতটি মুদ্রা আর আমার বন্ধু পাবে একটি মুদ্রা।“

উজির গণনাকারীর ভীষণ প্রশংসা করলেন। তাঁর হিসাব অনুসারেই মুদ্রাগুলো ভাগ করে দিতে আদেশ দিলেন। গণিতবিদের প্রমাণটি ছিল যুক্তিসঙ্গত, নিখুঁত ও অকাট্য।

তবে এই বণ্টন যতই ন্যায়ানুগ হোক, বেরেমিজের নিজের তা পছন্দ হয়নি। উজিরের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, “এই ভাগ, যেখানে আমি সাতটি মুদ্রা পাচ্ছি আর আমার বন্ধু একটি পাচ্ছে, এটা গাণিতিকভাবে সঠিক হলেও আল্লাহর কাছে এটি সুন্দর নয়।“

মুদ্রাগুলো একত্র করে তিনি সমান দুই ভাগ করলেন। এক ভাগ নিজে রেখে আরেক ভাগ আমাকে দিয়ে দিলেন।

“ইনি এক অসাধারণ মানুষ।” বললেন উজির। তিনি আট কয়েনের বণ্টন মেনে নেননি। প্রমাণ করলেন তিনি পাবেন সাতটি আর তার বন্ধু পাবেন একটি। পরে কী করলেন? সমান দুই ভাগ করেও বন্ধুকেও সমান অংশ দিলেন।“

“এই যুবকটি শুধু জ্ঞানী আর দক্ষ গণিতবিদই না, একজন উদারচিত্তের বন্ধুও বটে। আজ থেকেই তাঁকে আমার সচিব নিয়োগ করলাম।“

“সম্মানিত উজির,” বললেন গণনাকারী, “দেখলাম, আপনি ৫৬ অক্ষরে আমার শোনা সবচেয়ে উচ্চ প্রশংসা করেছেন। আল্লাহ তোমার মঙ্গল ও হেফাজত করুন।“

আমার বন্ধুর দক্ষতার কারিশমা শব্দ ও অক্ষর পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। এমন ঈর্ষণীয় মেধায় আমরা সবাই চমকপ্রদ হলাম।

০৫

কথায় এত শব্দ

**এ অধ্যায়ে**

সোনালী হংসী নিবাসে যাওয়ার পথে বেরেমিজ সামির যেসব অসাধারণ হিসাব-নিকাশ করেছেন। আমাদের পুরো ভ্রমণে যতগুলো শব্দ ও গড়ে মিনিটে যত শব্দ ব্যবহার করেছেন। কীভাবে তিনি একটি সমস্যার সমাধান করেছিলেন।

শেখ নাসির ও উজির মালুফের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা সোনালী হংসী নামে একটি মুসাফিরখানায় উঠলাম। এটা সুলাইমান মসজিদের পাশেই অবস্থিত। সেখানে কাছের পরিচিত এক উটচালকের কাছে আমাদের উটগুলো বিক্রি করলাম।

পথিমধ্যে আমি বেরেমিজকে বললাম, “দেখেছো বন্ধু, আমি বলেছি না, তোমার মতো এমন গুণতে ওস্তাদ মেধাবী বাগদাদে সহজেই চাকরি পেয়ে যাবে। তুমি আসতে না আসতেই তারা তোমাকে উজিরের সচিবের পদ গ্রহণ করতে প্রস্তাব দিল। এখন আর তোমাকে খোই গ্রামের বিষণ্ণ ও পাথুরে জায়গায় ফিরে যেতে হবে না।

গণনাকারী বললেন, “এখানে হয়ত আমি উন্নতি করতে পারব। ধনী হব। কিন্তু আবার একদিন পারস্য ফিরে গিয়ে আমি আমার স্বদেশকে দেখতে চাই। সে তো এক অকৃতজ্ঞ যে এক মরুদ্দ্যানে উন্নতি ও সুবিধা পেয়ে গিয়ে নিজের দেশ ও শৈশবের বন্ধুদের ভুলে যায়।“

আমার বাহুতে হাত রেখে তিনি বললেন, “আমরা ঠিক একদিন একসঙ্গে চলেছি। এই সময়ে বিভিন্ন জিনিস ব্যাখ্যা ও আলাপ-আলোচনা করতে গিয়ে আমি ঠিক ৪,১৪,৭২০ টি শব্দ উচ্চারণ করেছি। আট দিনে ১১,৫২০ মিনিট হয়। অতএব, সহজেই হিসাব করা যায়, এই ভ্রমণের সময় আমি গড়ে প্রতি মিনিটে ৩৬টি শব্দ বলেছি। মানে ঘণ্টায় ২,১৬০ শব্দ। সংখ্যাগুলো বলছে, আমি কম কথা বলেছি। আমি কথা বলেছি সতর্কতার সাথে। অর্থহীন আলাপ করে তোমার সময় নষ্ট করিনি। অল্প কথার ও অনেক বেশি নিরব মানুষ অনাকর্ষণীয় প্রাণীতে পরিণত হন। আবার যারা অনর্গল কথা বলে যেতেই থাকে তারা সঙ্গীকে বিরক্ত করে ফেলেন। অতএব, অর্থহীন আলাপ পরিহার করা উচিত। আবার মুখ বন্ধ করে রেখে সোজন্যহীনও হওয়া যাবে না। এ প্রসঙ্গে তোমাকে একটি ঘটনা বলব।“

একটু দম নিয়ে গণনামানব শুরু করলেন:

“পারস্যের তেহরানে এক বৃদ্ধ বণিকের তিন ছেলে ছিল। একদিন বণিক তাদেরকে ডেকে বললেন, ‘যে অর্থহীন কথা না বলে সারাদিক কাটাতে পারবে পুরস্কার হিসেবে ২৩টি স্বর্ণমুদ্রা দেব।‘

“রাতের বেলা তিন ছেলেই বৃদ্ধ বাবার শিয়রে হাজির হলো। বড় ছেলে বলল, ‘বাবা, আমি সব ধরনের অর্থহীন বাক্যালাপ থেকে বিরত থেকেছি। আমার আশা, আমিই সেজন্যে প্রতিশ্রুত পুরস্কারটি পাব। আপনার নিশ্চয় মনে আছে ২৩টি স্বর্ণমুদ্রা দেবেন বলেছিলেন।‘

“দ্বিতীয় ছেলেও আসল। বাবার হাত চুম্বন করে বলল, ‘শুভ সন্ধ্যা, বাবা।’

“সর্বকনিষ্ঠ ছেলে কোনো কথাই বলল না। বাবার কাছে এসে হাত প্রসারিত করে পুরস্কার তুলে দেওয়ার ইঙ্গিত করল। বণিক তিন ছেলেরই আচরণ দেখলেন। বললেন, ‘বড় ছেলে আমার কাছে এসে নানান ধরনের অর্থহীন কতা বলে আমার মনযোগ হারিয়ে ফেলল। ছোট ছেলে অতিমাত্রায় অল্পভাষী। অতএব, পুরস্কার পাবে দ্বিতীয় ছেলে। সে সতর্কতার সাথে কথা বলেছে। বাগাড়ম্বর করেনি। সরল আচরণ করেছে। দম্ভ দেখায়নি।‘ ”

গল্প শেষ করে বেরেমিজ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, “তোমার কি মনে হয় বৃদ্ধ লোকটি ছেলের সাথে সঠিক আচরণ করেছে?”

আমি জবাব দিলাম না। ভাবলাম, এই বিস্ময়কর মানুষটার সাথে ২৩টি মুদ্রা নিয়ে আলাপ না করাই ভাল। তিনি তো সবসময় সবকিছুকে সংখ্যায় পরিণত করেন। গড় বের করেন। সমস্যা সমাধান করেন।

একটু পর আমরা সোনালী হংসীতে পৌঁছলাম। মুসাফিরখানার পরিচালকের নাম সালিম। একসময় বাবার হয়ে কাজ করতেন। আমাকে দেখে হাসলেন, আবার কাঁদলেন, “খোকা, আল্লাহ তোমার সহায় হোন। এখন ও সবসময় তোমার ইচ্ছা পূরণে আমি প্রস্তুত।“

তাকে বললাম, আমার ও আমার গণনাকারী বন্ধু উজিরের সচিব বেরেমিজ সামিরের জন্যে কক্ষ প্রয়োজন।

সালিম জিজ্ঞেস করল, “ইনি একজন গণিতবিদ? তাহলে আমাকে একটি কঠিন সমস্যা থেকে উদ্ধার করতে একদম ঠিক সময়েই এসেছেন তিনি। এক স্বর্ণকারের সাথে এইমাত্র আমার তর্ক হলো। অনেক তর্কের পরেও আমরা সমস্যাটির সমাধান করতে পারিনি।”

মুসাফিরখানায় মহান এক গণিতবিদের আগমন ঘটেছে শুনে বেশ কিছু কৌতূহলী মানুষের সমাগম হয়েছে। স্বর্ণকারকে ডেকে আনা হলো। সেও সমস্যার সমাধানে দারুণ ইচ্ছুক।

“সমস্যাটা কী?” জিজ্ঞাসা বেরেমিজের।

“এই লোকটা,” স্বর্ণকারকে দেখিয়ে বৃদ্ধ সালিম বললেন, “সিরিয়া থেকে বাগদাদ এসেছে দামী রত্নপাথর নিয়ে। সে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, তার সব রত্ন ১০০ দিনারে বিক্রি করতে পারলে থাকার খরচ হিসেবে ২০ দিনার দেবে আমাকে। আর ২০০ দিনারে বিক্রি করতে পারলে ৩৫ দিনার দেবে। কয়েকদিনের চেষ্টার পরে সে সবগুলো রত্ন ১৪০ দিনারে বিক্রি করেছে। এখন আমাকে কত দেওয়া উচিত?”

“২৪.৫ দিনার! এটাই সঠিক হিসাব। ” সিরিয়ানের জবাব। “২০০ দিনারে বিক্রি করলে যদি ৩৫ দিনার দেওয়া লাগে, তাহলে তার দশ ভাগের এক ভাগ প্রতি ২০ দিনারের জন্য আমাকে দিতে হবে ৩.৫ দিনার। এখন, তোমরা জানো, আমি রত্ন বিক্রি করে ১৪০ দিনার পেয়েছি, যা আমার হিসাব মতে ২০ এর ৭ গুণ। অতএব, রত্নগুলো ২০ দিনারে বিক্রি করলে ৩.৫ দিনার ভাড়া দিতে হলে ১৪০ দিনারে বিক্রি করলে ভাড়া হবে ৭ গুণ ৩.৫। মানে ২৪.৫ দিনার।“

২০০: ৩৫ :: ১৪০:ক

ক =

“তুমি ভুল বলেছো,” বৃদ্ধ সালিম রেগে বললেন। “আমার হিসাব মতে আমি ২৮ দিনার পাব। শোনো! ১০০ দিনারে বিক্রি হলে আমি পেতাম ২০ দিনার। ১৪০ দিনারের জন্যে তাহলে পাব ২৮ দিনার। দাঁড়াও, দেখাচ্ছি।

“১০০ দিনারের জন্যে ২০ দিনার পেলে এর দশ ভাগের এক ভাগ ১০ দিনারের জন্যে পাব ২ দিনার করে। ১৪০ হলো ১০-এর ১৪ গুণ। তাহলের ১৪০ দিনারের জন্য পাব ১৪ গুণ ২ দিনার। মানে ২৮ দিনার।

১০০: ২০:: ১৪০: ক

“অতএব, আমাকে ২৮ দিনার দিতে হবে।“ বৃদ্ধ সালিমের কণ্ঠে উত্তেজনা।

“শান্ত হও তোমরা,” গণনাকারী বললেন। “মাথা ঠাণ্ডা রেখে হিসাব করতে হবে। তাড়াহুড়ো করলে রাগ আর ভুল হয়। তোমাদের দুজনের হিসাবই ভুল। আমি দেখাচ্ছি।“

“কথা ছিল, ১০০ দিনারে রত্ন বিক্রি হলে হলে ভাড়া হবে ২০ দিনার আর ২০০ দিনারে বিক্রি হলে ৩৫ দিনার। মানে এ রকম:

|  |  |
| --- | --- |
| বিক্রয় মূল্য | ভাড়া |
| ২০০ | ৩৫ |
| -১০০ | -২০ |
| ১০০ | ১৫ |

“দেখতেই পাচ্ছো, বিক্রয়মূল্যে ১০০ দিনারের পার্থক্য হলে ভাড়ার পার্থক্য হয় ১৫ দিনার। বুঝতে পেরেছো?”

“একদম পরিষ্কারভাবে বুঝেছি।“ দুজনই বলল সমস্বরে।

“তাহলে,” গণিতবিদ বলে গেলেন, “বিক্রয়মূল্য ১০০ দিনার বাড়লে ভাড়ার পার্থক্য হয় ১৫ দিনার। তাহলে বিক্রয়মূল্য ৪০ টাকা বাড়লে ভাড়া কত বৃদ্ধি পাওয়া উচিত? ৪০ হলো ২০-এর দ্বিগুণ। ২০ হলো ১০০-এর ৫ ভাগের এক ভাগ। আবার ১৫ এর ৫ ভাগের এক ভাগ হলো ৩। তাহলে বিক্রয়মূল্য ২০ দিনার বাড়লে ভাড়া বাড়বে ৩ দিনার। তাহলে ৪০ দিনারের পার্থক্যের জন্যে ভাড়া বাড়বে ২০-এর দ্বিগুণ, মানে ৬ দিনার। অতএব, ১৪০ দিনারে রত্ন বিক্রি করায় ভাড়া হবে ২০ + ৬ = ২৬ দিনার।১

১০০: ১৫:: ৪০:ক

“বন্ধুগণ, সংখ্যাকে দেখতে সরল হলেও অনেক সময় সেরা জ্ঞানীকেও কুপোকাত করে দিতে পারে। যে ভাগকে দেখে মনে হয় নিখুঁত তাও হতে পারে পারে ভুলে ভরা। হিসাবের অনিশ্চয়তা থেকেই আসে গণিতবিদের সম্মান। চুক্তি অনুসারে মুসাফিরখানাকে ২৬ দিনার দিতে হবে, ২৪.৫ নয়। “

“ভদ্রলোক ঠিকই বলেছেন,“ স্বর্ণকার মেনে নিলেন। “আমি বুঝতে পেরেছি, আমার হিসাব ছিল ভুল।“

তিনি বৃদ্ধ সালিমকে ২৬ দিনার বের করে দিলেন। আর একটি রত্নপাথরের আংটি তুলে দিলেন বেরেমিজের হাতেও। প্রকাশ করলেন কৃতজ্ঞতা। জড় হওয়া মানুষগুলো গণনাকারীর প্রশংসা করতে করতে নিজ নিজ পথ ধরল।

অনুবাদকের নোট

১। এটা আমরা আরেকভাবে বের করতে পারি। ১৪০ দিনারে কত ভাড়া হবে সেটা বের করতে হলে ১০০ এবং ২০০ দুই বিক্রয়মূল্যই মাথায় রাখা লাগবে। এখন দুটোর গড় করে ফেললে কেমন হয়? ৩৫ এবং ২০ এর গড় ২৬.৫। কিন্তু বিক্রয়মূল্য ১৪০ তো ১০০ এবং ২০০ থেকে সমান দূরে নয়। কিন্তু গড় করে ফেললে তো দুটো সংখ্যা সমান গুরুত্ব পায়। অতএব কোন সংখ্যাকে কতটুকু গুরত্ব দেব তা ঠিক করতে হবে। ১০০ এবং ২০০ এর ব্যবধানকে ১০ ভাগ করি। ১৪০-এর আগে থাকে ৪ ভাগ আর পরে থাকে ৬ ভাগ। ১৪০ যেহেতু ১০০ এর বেশি কাছে, তাই ১০০কে (মানে ভাড়া ২০কে) বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত। তাহলে ২০-এর গুরুত্ব (পরিসংখ্যানের ভাষায় weight) হবে ৬, আর ৩৫ এর গুরুত্ব ৪। আর ওয়েট থাকা অবস্থায় গড় করতে ভাগ দিতে হবে মোট ওয়েট দিয়ে। তাহ্লে

০৬

সংখ্যা দিয়ে পরীক্ষা

**এ অধ্যায়ে**

উজির মালুফের সাথে সাক্ষাতের সময় আমাদের সাথে যা ঘটেছিল। আমাদের সাথে একজন কবির দেখা হয়, হিসাব-নিকাশের প্রতি যার আস্থা ছিল না। গণনাকারী এখানে বড় একটি কাফেলার উট গণনা করার একটি মৌলিক পদ্ধতি দেখিয়েছেন। পাত্রীর বয়স ও উটের কানের সংখ্যার মধ্যে মিল স্থাপন করেছেন। বেরেমিজ দ্বিঘাত বন্ধুত্ব ও বাদশা সুলাইমান (আ:) সম্পর্কে জেনেছেন।

দ্বিতীয় নামাজের পরে আমরা তাড়াতাড়ি করে উজির ইব্রাহিম মালুফের বাসায় গেলাম। এখানে এসে দারুণ বিস্ময়াভিভূত হলাম। ভারী লোহার গেট পার হয়ে আমরা একটি সংকীর্ণ করিডোরে পা রাখলাম। পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে একজন কৃষাঙ্গ দাস। কাঁধে সোনার বাহুবন্ধনী। প্রাসাদের ভেতরের বাগানে প্রবেশ করলাম আমরা। অপরূপ সুন্দর বাগানটিতে দুই সারি কমলা গাছ ছায়া বিলিয়ে দিচ্ছে। এখান থেকে বিভিন্ন দিকে অনেকগুলো দরজা চলে গেছে। কোনো কোনোটা নিশ্চয় হেরেমের দিকে গেছে।

দুজন দাস ফুল তুলছিল। আমাদেরকে দেখে সরে গিয়ে পিলারের আড়ালে দাঁড়াল। উঁচু দেয়ালের ভেতর দিয়ে সরু একটি পথ দিয়ে আমরা একটি উঠোনে এসে পৌঁছলাম। উঠোনের ঠিক মধ্যখানে চমৎকার একটি ঝর্ণা। তিনটি ফোয়ারা পানি ছিটাচ্ছে। তিনটি তরল রেখা সূর্যের আলোতে চিকচিক করছে।

দাসকে অনুসরণ করে আমরা উঠোন পার হয়ে খোদ প্রাসাদে প্রবেশ করলাম। সামনে পড়ল অনেকগুলো সুশোভিত কক্ষ। রূপার প্রলেপযুক্ত রং-বেরংয়ের দামী কাপড় ঝোলানো দেয়ালে। শেষ পর্যন্ত উজিরের সাথে দেখা হলো। বিশাল কুশনে বসে দুই বন্ধুর সাথে আলাপ করছিলেন তিনি।

একজনকে চিনলাম। শেখ সালেম নাসির। আমাদের মরু অভিযানের সহযাত্রী। আরেকজন ছোটখাট গোলগাল চেহারার মানুষ। চেহারায় দয়া ফুটে আছে। দাড়িতে হালকা পাক ধরেছে। জামা-কাপড় কেতাদুরস্ত। গলায় একটা চারকোণা পদক ঝুলছে। পদকের অর্ধেকটা দেখতে সোনালী হলুদ। বাকিটা ব্রোঞ্জের মতো কালো।

উজির মালুফ আমাদেরকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন। পদকধারীর দিকে তাকিয়ে বললেন, “হে প্রিয় কবি, ইনি হচ্ছে আমাদের মহান গণনাকারী। তাঁর সাথের তরুণ মানুষটি বাগদাদের বাসিন্দা। আল্লাহর পথে বেরিয়ে পড়ার পর আকস্মিকভাবে তার সাথে তাঁর সাক্ষাৎ।“

সম্মানিত শেখকে আমরা ভক্তিভরে সালাম দিলাম। পরে আমরা জেনেছি, তাঁর সঙ্গী মানুষটি ছিলেন বিখ্যাত কবি আব্দুল হাজমিদ। যিনি খলিফা আল-মুতাসিমেরও কাছে বন্ধু। গলার পদকটি তিনি পেয়েছেন খলিফার কাছ থেকেই। কাফ, লাম ও আইন অক্ষর তিনটি ছাড়াই ৩০, ২০০ পঙতির কবিতা লেখার পুরস্কার এটি।

কবে হেসে হেসে বললেন, “বন্ধু মালুফ, এই পারস্যদেশীয় গণনাকারীর অপূর্ব ক্ষমতা বিশ্বাস করতে আমার কষ্ট হচ্ছে।“ সংখ্যাকে মিশ্রিত করলে একটি চালাকি তৈরি হয়। যাকে বলা যায় বীজগাণিতিক চতুরতা। একবার মোদাদের পুত্র রাজা এল-হারিতের কাছে এক বিজ্ঞ মানুষ আসেন। তিনি নাকি বালু দেখে ভাগ্য বলতে পারেন। রাজা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘তুমি কি নিখুঁত হিসাব করতে পারো?’ বিস্ময়ের আবেশ কাটার আগেই তিনি বললেন, ‘নিখুঁত হিসাব করতে না পারলে আপনার সবগুলো পরিকল্পনা অর্থহীন; আপনি যদি নিছক হিসাবের মাধ্যমে সেগুলো করেন তবে সেগুলো আমি অবিশ্বাস করি।‘ ভারতে একটি প্রবাদ শিখেছি, ‘হিসাবকে সাতবার অবিশ্বাস করুন, আরে গণিতবিদকে এক শ বার।‘ “

উজির বললেন, “অবিশ্বাস দূর করার জন্যে আমাদের অতিথিকে চূড়ান্তভাবে একবার পরীক্ষা করা যাক।“ এটা বলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। বেরেমিজের বাহু ধরে প্রাসাদের একদিকের বারান্দায় নিয়ে গেলেন। জানালা খুলে আরেকটি উঠোনের দৃষ্টি আকর্ষণ করালেন। সেখানে অনেকগুলো উটের সারি। সবগুলো ভাল জাতের। দেখলাম, দুটো কি তিনটে মঙ্গোলীয় সাদা উট। বাকিগুলো পশমহীন চামড়ার ক্যারেহ।

উজির বললেন, “দারুণ এই উটগুলো আমি গতকাল কিনেছি। আমি এগুলোকে উপহার হিসেবে আমার পুত্রবধুর বাড়িতে পাঠাতে চাই। আমি জানি এখানে ঠিক কতগুলো উট আছে। তুমি কি বলতে পারবে কতগুলো আছে?”

পরীক্ষাকে আরও কঠিন করতে উজির সাহেব উটগুলোর দিকে মুখ করে শিস দিলেন। আমি হতবাক হয়ে গেলাম। এখানে অনেক অনেক উট। তাও আবার ছোটাছুটি করছে এদিক-সেদিক। আমার বন্ধু ভুল করলেই আমাদের ভ্রমণের আনন্দ ছাই হয়ে যাবে।

কিন্তু ঘুরে বেড়ানো উটের পালের দিকে চোখ বুলিয়ে আমার বন্ধু বেরেমিজ বললেন, “সম্মানিত উজির, আমার হিসাব বলছে, এখানে উট আছে ২৫৭টি।“

“একদম সঠিক!”উজির জানিয়ে দিলেন। “আল্লাহর কসম, দুইশন সাতান্নটিই উট আছে।“

“আপনি এত দ্রুত কীভাবে বললেন, তাও নিখুঁত করে?” কবির চোখে-মুখে এক সাগর কৌতূহল।

“খুব সহজ,“ বললেন বেরেমিজ। “একটা একটা করে উট গণনায় কোনো মজা নেই। তাই আমি প্রথমে খুরগুলো গুণলাম। পরে কানগুলো। মোট পেলাম ১৫৪১। সাথে যোগ করলাম ১। একে ৬ দিয়ে ভাগ করলাম। নিঃশেষে ভাগ হয়ে ২৫৭ হলো।“

“অসাধারণ,” উজির কণ্ঠে প্রশংসা। “কত মৌলিক চিন্তা! কে ভেবেছিল, নিছক মজা পাওয়ার জন্যে কেউ কান ও খুর গুণবে?”

“আমি বলব, “ বেরেমিজ বললেন, “মাঝেমাঝে গণনাকারীর উদাসীনতা বা অক্ষমতা হিসাবকে কঠিন করে তোলে। একবারের ঘটনা। আমি তখন খোই শহরে ছিলাম। আমি মনিবের পশুর পাল দেখছিলাম। এসময় এক ঝাঁক প্রজাপতি উড়ে গেল। একজন রাখাল জিজ্ঞেস করল আমি সেগুলো গুণতে পারব কি না। ‘আট শ ছাপ্পান্ন,’ বললাম আমি। রাখাল বলল, ‘কী! আট শ ছাপ্পান্ন? এত বেশি?’ তখন আমি বুঝলাম, আমি প্রজাপতির বদলে গুণেছি পাখার সংখ্যা। দুই দিয়ে ভাগ দিতেই সঠিক সংখ্যা পেলাম।

শুনে উজির খুব মজা পেলেন। সঙ্গীতের মতো মিষ্টি সুরে হেসে উঠলেন।

“সবকিছুই বুঝলাম,” কবি বলছেন। “উটের সঠিক সংখ্যা পেতে চার খুর ও দুই কানের জন্য ৬ দিয়ে ভাগ দিতে হবে বুঝলাম। কিন্তু ১৫৪১ কে ৬ দিয়ে ভাগ দেওয়ার আগে ১ যোগ করতে হলো কেন?”

“খুব সহজ,” জবাব দিলেন বেরেমিজ। “কান গুণতে গিয়ে দেখলাম, একটি উটের একটি কান নেই। সে কারণেই ১ যোগ করে নিয়েছি।“

এবার বেরেমিজ উজিরের দিকে তাকিয়ে বললেন, “বেয়াদবি মাফ করলে জিজ্ঞেস করতাম, আপনার পুত্রবধুর বয়স কত?”

“না, না, অসুবিধা নেই।“ উজির বললেন, “আস্তিরের বয়স ষোলো।“ এবার তিনি সংশয় নিয়ে জানতে চাইলেন, “কিন্তু ওর বয়সের সাথে তো আমি যে উটগুলো উপহার পাঠাব সেগুলোর সাথে কোনো সম্পর্ক দেখছি না।“

“আমি শুধু ছোট একটি পরামর্শ দিতে চাই।“ বললেন বেরেমিজ। ত্রুটিযুক্ত উটটি পাল থেকে সরিয়ে নিলে উট থাকবে ২৫৬টি। যা ১৬-এর বর্গ। ১৬ গুণ ১৬ সমান ২৫৬। আস্তিরের বাবাকে পাঠানো উপহার তাহলে গাণিতিকভাবে নান্দনিক হবে। ২৫৬ কে ২-এর ঘাত আকারে প্রকাশ করা যায় (২৮)। আর ২৫৭ হলো মৌলিক সংখ্যা। বর্গ সংখ্যার সাথে ভালাবাসা বেশি মিলে যায়। বর্গ সংখ্যা নিয়ে মজার একটি গল্প প্রচলিত আছে। চাইলে শোনাতে পারি।“

“আনন্দের সাথেই শুনব,” বললেন উজির। “সুন্দর গল্প সুন্দর করে বললে শুনতেও সুন্দর লাগে। আমার শোনার কৌতূহল হচ্ছে।“

সৌজন্য প্রকাশ করে গণনাকারী শুরু করলেন, “বাদশা সুলাইমান (আ:) সম্পর্কে বলা হয়, সৌজন্য ও জ্ঞানের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে তিনি তাঁর বাগতত্তা, সুন্দরী রানি বিলকিসকে ৫২৯ টি মুক্তার একটি বাক্স উপহার দেন। ৫২৯ কেন? কারণ ৫২৯ হলো ২৩-এর বর্গ। মানে ২৩ গুণ ২৩ সমান ৫২৯। আর ২৩ ছিল রানির বয়স। তরুণী আস্তিরের বয়স ১৬। তাই ২৫৬ টি উট দেওয়া সুন্দর দেখায়।“

সবাই গণনাকারীর দিকে তাকাল বিস্ময় নিয়ে। তিনি শান্ত স্বরে বললেন, “১৬-এর বর্গ ২৫৬, যার অঙ্কগুলো যোগ করলে পাওয়া যায় ১৩। ১৩-এর বর্গ ১৬৯। ১৬৯-এর অঙ্কগুলোর যোগফল আবার ১৬। ফলে ১৩ ও ১৬ সংখ্যা দুটির মধ্যে দারুণ একটি সম্পর্ক আছে। একে আমরা বলতে পারি দ্বিঘাত সম্পর্ক। সংখ্যাদের বাকশক্তি থাকলে আমরা হয়ত তাদের আলাপ শুনতাম: ১৬ ১৩কে বলছে, ‘আমি তোমার প্রতি আমাদের বন্ধুত্বের শ্রদ্ধা নিবেদন করতে চাই। আমার বর্গ ২৫৬, যার অঙ্কগুলোর যোগফল ১৩।‘ ১৩ উত্তরে বলছে, ‘তোমার সৌজন্যের জন্যে ধন্যবাদ, প্রিয় বন্ধু। আমিও তোমাকে উপহার দিতে চাই। আমার বর্গ ১৬৯, যার অঙ্কগুলোর যোগফল ১৬। ‘

“আমার মনে হয় ২৫৬’র পক্ষে আমি যথেষ্ট কারণ উল্লেখ করেছি। ২৫৭’র চেয়ে সংখ্যাটি অনেক অনেক সুন্দর। “

“তোমার বুদ্ধিটা খুব অনন্য,” উজির উত্তর দিলেন। “হ্যাঁ, এটাই করব আমি, যদিও মানুষ বলবে আমি সুলাইমানকে (আ) নকল করেছি। কবির দিকে ঘুরে উজির বললেন, “দেখছি এই মানুষটি গল্প যেমন বলতে পারেন, তেমনি বুদ্ধিমত্ত্বার সাথে তুলনাও টানতে পারেন। তাকে সচিব বানিয়ে তো ভালই করেছি।“

“সম্মানিতে উজির, আমি দুঃখিত,” বেরেমিজ বললেন, “আপনার প্রস্তাব আমি গ্রহণ করতে পারি এক শর্তে। আমার বেকার ও নিঃস্ব বন্ধু হানাক তাদে মাইয়ারও একটি চাকরি প্রয়োজন। “

গণনাকারীর উদারতা দেখে আমি হতবাক হয়ে গেলাম। তিনি এভাবে আমাকে উজিরের সামনে তুলে ধরবেন তা আমি ভাবতেও পারিনি।“

“আপনি উত্তম অনুরোধ করেছেন।“ উজির জানালেন। “আপনার বন্ধুকে নথিলেখকের দায়িত্ব দিচ্ছি। সাথে থাকবে যথাযোগ্য বেতন।“

উজির ও মহানুভব বেরেমিজের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আমি সাথে সাথে সম্মত হয়ে গেলাম।

০৭

চার চারের কারিশমা

আমাদের প্রথমবার বাজারের যাওয়ার গল্প। বেরেমিজ ও নীল পাগড়ির কাহিনি। চারটি চারের ঘটনা। পঞ্চাশ দিনারের সমস্যা। সমস্যার সমধান করে বেরেমিজের সুন্দর উপহার পাওয়ার গল্প।

কয়েক দিন পরের ঘটনা। উজিরের অফিসের কাজ শেষ করে বাজার ও বাগদাদের বাগানে ঘুরতে বের হলাম। সেদিন বিকেলে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি কোলাহল ছিল। এর কারণ কয়েক ঘণ্টা আগেই দামেশক থেকে কিছু ধনী কাফেলা এসে পৌঁছেছে। কাফেলার আগমন ঘটলে সবসময় সবাই প্রাণোচ্ছ্বল হয়ে উঠত। অন্য দেশে কী জিনিস তৈরি হচ্ছে তা জানার এটাই একমাত্র উপায়। ভিনদেশী ব্যবসায়ীদের সাথেও মেশার সুযোগ আসে এর মাধ্যমে।

জুতার বাজারে তো প্রবেশ করাই অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। কী খালি জায়গা, কী দোকান—সর্বত্র নতুন নতুন পণ্যের বস্তা ও বাক্সের ছড়াছড়ি। দামেশকের লোকেরা বড় বড় রংবেরংয়ের পাগড়ি ও কোমরে অনুশীলনের অস্ত্র নিয়ে বাজারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। উদাসীনভাবে দেখছে এ দোকান, সে দোকান। ধূপ, জর্দা ও মসলার তীব্র গন্ধ চারদিকে। সবজিবিক্রেতারা মারাত্মক রকম ঝগড়া করছে। অপমান করছে একে অন্যকে। মসুলের একজন তরুণ গিটারবাদক কিছু বস্তার উপর বসে বিমর্ষ ও একঘেয়ে সুরে গান গাইছে:

মানুষের জীবনের গুরুত্বই বা কী?

যদি মানুষ বেঁচে থাকে সম্ভাব্য সবচেয়ে সরলভাবে

সে ভাল বা খারাপ যাই হোক

আমার কথা এ পর্যন্তই

দোকানদাররা দোকানের সামনেও পণ্য সাজিয়ে রেখেছে। আরবদের উর্বর চিন্তাশক্তি কাজে লাগিয়ে নিজের অধিকার বেশি করে আদায় করছে।

“এই দেখুন, এই জামাটা একজন আমিরের গায়েই মানায়!”

“বন্ধুগণ, এই দারুণ সুগন্ধি আপনাকে স্ত্রীর কথা মনে করিয়ে দেবে।“

“হুজুর, এই চপ্পল ও এই কাফতান জুতাগুলো দেখুন। এগুলো জ্বিনেরা ফেরেশতাদেরকে উপহার দেয়।“

একটি রুচিশীল নীল পাগড়ি বেরেমিজের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। কুঁজো এক সিরীয় লোক চার দিনারে সেটা বিক্রি করছিল। এই দোকানীর ঘরটাও ছিল একটু ব্যতিক্রমী। এখানের সবকিছু— পাগড়ি, বাক্স, খঞ্জর, চুড়ি ইত্যাদি—সবকিছুর দাম চার দিনার করে। উজ্জ্বল বর্ণে একটি ব্যানার লেখা।

এটা দেখে বেরেমিজ পাগড়িটা কিনতে আগ্রহী হলেন। বললাম, “এমন অপব্যয় পাগলামি ছাড়া কিছু না। আমাদের কাছে অল্প টাকা আছে। এখনও আমরা সরাইখানার ভাড়াও দেইনি।“

“আমার আকর্ষণ পাগড়ির দিকে নয়,” বেরেমিজ বললেন, “তুমি কি খেয়াল করেছো এই দোকানের নাম ‘চারটি চার?’ এই কাকতালীয় ঘটনার গুরুত্ব অস্বাভাবিক রকমের।”

“কাকতালীয় ঘটনা কেন?”

“এই দোকানের ক্যালকুলাসের একটি অসাধার বিষয়কে মনে করিয়ে দেয়। চারটি চার ব্যবহার করে আমরা যেকোনো সংখ্যায় পৌঁছতে পারি।“

বেরেমিজকে এর রহস্য জিজ্ঞেস করার আগেই তিনি মেঝেতে ছড়িয়ে থাকা নরম বালুতে লিখে বোঝাতে শুরু করলেন।

“তুমি কি শূন্য চাও? এর চেয়ে সহজ কিছু হয় না। শুধু লিখো:

৪৪- ৪৪

“এখানে চারটি চার আছে, যার মান শূন্য।“

“তুমি কি এক পেতে চাও? সবচেয়ে সহজ উপায় হলো:

|  |
| --- |
| ৪৪ |
| ৪৪ |

“৪৪কে ৪৪ দিয়ে ভাগ দিলেই কেল্লা ফতে!”

“দুই বানাতে চাইলেও চারটি চার দিয়ে সহজেই লেখা যায়:

“দেখতেই পাচ্ছো, ভগ্নাংশ দুটির যোগফল ২।

“তিন তো আরও সোজা। শুধু এভাবে লিখতে হবে:

এখানে লবের যোগফল ১২, যাকে ৪ দিয়ে ভাগ দিলেই ৩ পাওয়া যায়।

“কিন্তু ৪ বানাবে কীভাবে?” আমার প্রশ্ন

“এর চেয়ে সহজ আর কিছু হয় নাকি?” বেরেমিজের উত্তর। “৪ তো অনেকভাবেই পাওয়া যায়। একটা দেখাচ্ছি:

দেখতেই পাচ্ছো, দ্বিতীয় পদের মান শূন্য। তারমানে রাশিটির মান ৪ + ০ = ৪।

দেখলাম, সিরীয় ব্যবসায়ী মনোযোগ দিয়ে বেরেমিজের কথা শুনছে। চার চারের সমাবেশ তাকে বেশ মুগ্ধ করেছে।

বেরেমিন বললেন, “পাঁচ বানাতে চাইলেও সমস্যা নেই।

“ছয় লিখব এভাবে:

“একটু ঘুরিয়ে লিখলেই পাব ৭:

“৮ বানানোও কোনো কঠিন কাজ নয়: ৪+৪-৪+৪

“৯ তো আরেক মজার সংখ্যা:

“এবার দেখাব দারুণ আরেক সংখ্যা:

“আমরা পেয়ে গেলাম ১০।“

কুঁজো দোকানী১ এতক্ষণ মনযোগ দিয়ে শুনছিল। এবার কথা বলে উঠল, “বুঝলাম, আপনি অনেক ভাল একজন গণিতবিদ। দুই বছর আগে আমি একটি গাণিতিক সমস্যায় পড়েছিলাম। সেটা সমাধান করে দিতে পারলে আপনি যে নীল পাগড়িটা কিনতে চাচ্ছেন তা আপনাকে উপহার দেব।“

এরপর দোকানদার সমস্যাটা বললেন।

“একবার মদিনার এক শেখ ও মিশরের কায়রোর এক লোককে ৫০ দিনার করে ধার দিয়েছিলাম। তিনি চার কিস্তিতে সেটা পরিশোধ করেন: ২০, ১৫, ১০, ৫। মানে এভাবে:

|  |  |
| --- | --- |
| পরিশোধিত অর্থ | বাকি থাকল |
| ২০ | ৩০ |
| ১৫ | ১৫ |
| ১০ | ৪ |
| ৫ | ০ |
| মোট ৫০ | মোট ৫০ |

“দেখুন পরিশোধিত অর্থ ও বাকি ঋণের যোগফল ৫০। আবার কায়রোর লোকটাও ৫০ দিনারই পরিশোধ করেছে। তবে কিস্তির পরিমাণ ছিল ভিন্ন:

|  |  |
| --- | --- |
| পরিশোধিত অর্থ | বাকি থাকল |
| ২০ | ৩০ |
| ১৮ | ১২ |
| ৩ | ৯ |
| ৯ | ০ |
| মোট ৫০ | মোট ৫১ |

“দেখুন প্রথম যোগলফটা ৫০। ঠিক আছে। কিন্তু অন্য যোগফলটি ৫১। এমন তো হওয়ার কথা নয়। এই কিস্তিগুলোর দ্বিতীয় অংশের যোগফলে বাড়তি ১ কোত্থেকে এল আমি বুঝতে পারছি না। জানি আমাকে ঠকানো হয়নি। আমি তো আমার পুরো ৫০ দিনারই পেয়েছি। কিন্তু ১ টাকার গড়বড় কীভাবে যে হলো?”

“বন্ধু,” বেরেমিজ শুরু করলেন, “অল্প শব্দেই এটা বুঝিয়ে দিচ্ছি। বাকি থাকা অর্থের সাথে মোট ঋণের কোনো সম্পর্ক নেই। ধরো ঋণ শোধ করা হয়েছে তিন কিস্তিতে: ১০, ৫ ও পরে ৩৫। তাহলে অবস্থাটা হবে এমন:

|  |  |
| --- | --- |
| পরিশোধিত অর্থ | বাকি থাকল |
| ১০ | ৪০ |
| ৫ | ৩৫ |
| ৩৫ | ০ |
| মোট ৫০ | মোট ৭৫ |

এখানে দেখা যাচ্ছে প্রথম যোগফল ৫০। অন্য দিকে বাকি থাকা অর্থের যোগফল ৭৫। এটা আসলে যে কোনো সংখ্যাই হতে পারে। ৮০, ৯০, ১০০, ২৬০, বা ৮০০ ইত্যাদি যে কোনো সংখ্যা। ঘটনাগ্রমেই কোনো একবার ৫০ হয়ে যেতে পারে।“

দোকানী সন্তুষ্ট।২ তিনি প্রতিশ্রুতিটা রাখলেন। বেরেমিজকে ৪ দিনারের পাগড়িটা উপহার দিয়ে দিলেন।

অনুবাদকের নোট

১। ইন্টারনেটে Four Fours লিখে সার্চ দিলেই পরবর্তী সংখ্যাগুলো তৈরির দারুণ সব পদ্ধতি পাওয়া যাবে।

২। বাকি থাকা অর্থের যোগফল আসলে অর্থহীন একটা কাজ। দেখতে হবে বাকি থাকা ঋণের পরিমাণ শূন্য (০) হলো কি না। শূন্য হয়ে গেলেই বুঝতে হবে আর কোনো ঋণ বাকি নেই। ১ টাকা করে পরিশোধ করতে থাকলে তো বাকি ঋণের পরিমাণ হবে ৪৯, ৪৮, ৪৭, … ইত্যাদি। এগুলোকে যোগ করা অর্থহীন।

০৮

সপ্তম আকাশ

বেরেমিজের জ্যামিতিতে ডুব। শেখ সালিম নাসির ও তাঁর মেষপালক বন্ধুদের সাথে আলাপ। বেরেমিজের ২১টি পানপাত্রের সমস্যার সমধান। হারানো দিনারের সমাধান।

সিরীয় ব্যবসায়ী থেকে সুন্দর উপহার পেয়ে বেরেমিজ খুব খুশী। বললেন, “জিনিসটা খুব ভালোভাবে বানানো হয়েছে।“ সব দিক থেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন পাগড়িটা। “তবে একটা খুঁত আছে এতে, যা সহজেই এড়ানো যেত। এর আকৃতিটা জ্যামিতিকভাবে সঠিক নয়।“

তাঁর দিকে ঘুরে তাকালাম। বিস্ময় লুকোতে ব্যর্থ হলাম। মৌলিক চিন্তার অধিকারী লোকটা সবকিছুকেই জ্যামিতি দিয়ে চিন্তা করার উপায় বের করে ফেলত। এখন পাগড়িকেও জ্যামিতির চোখে দেখছে।

“বন্ধু, আমি জ্যামিতিক আকৃতি মেনে চলা পাগড়ি চাই বলে তো অবাক হওয়ার কিছু নেই।“ বললেন পারস্যের পণ্ডিত। “সবকিছুতেই জ্যামিতি আছে। বিভিন্ন জিনিসের সাধারণ ও নিখুঁত আকৃতির দিকে তাকাও। ফুল, পাতা ও অসংখ্য প্রাণীর মধ্যে যে প্রতিসাম্য দেখা যায় তার দিকে একবার তাকাও। আবারও বলছি, জ্যামিতি আছে সবখানে। আছে গোল সূর্যে, আছে পাতায়, রংধনুতে, প্রজাপতিতে, হীরায়, তারামাছ ও এমনকি ক্ষুদ্র বালুকণায়ও। প্রকৃতিতে অসীম রকম ভিন্ন ভিন্ন জ্যামিতিক আকৃতি আছে।

বাতাসে উড়ে চলা কাক এর দেহকে নিয়ে যায় দারুণ এক রেখা বরাবর। উটের শিরায় বয়ে চলা রক্তও কঠোর জ্যামিতিক নীতি মেনে চলে। স্তন্যপায়ীদের মধ্যে এর অনন্য কুঁজ অসাধারণ এক উপবৃত্ত (ellipse)। শিয়ালের দিকে ছুঁড়ে মারা পাথর বাতাসের সুন্দর এক রেখা ধরে চলে, যার নাম পরাবৃত্ত (parabola)। মৌমাছি বাসা বানায় ছয় কোণার প্রিজম দিয়ে দিয়ে। এই জ্যামিতিক আকৃতির মাধ্যমে সে সবচেয়ে পরিমিতভাবে উপাদান ব্যবহার করে।

জ্যামিতি আসলে সবখানে আছে। তবে সেটা দেখার জন্যে চোখ প্রয়োজন। বোঝার জন্যে বুদ্ধি প্রয়োজন। বিস্মিত হতে চাই সে রকম চেতনা। সাদাসিধে বেদুইনরা এসব জ্যামিতিক আকৃতি দেখে। কিন্তু বোঝে না। সুন্নিরা সেগুলো বোঝে, কিন্তু মূল্য দেয় না। তবে শিল্পীরা চিত্রগুলোর চমকারিত্ব ও সৌন্দর্য উপলব্ধি করেন। শৃঙ্খলা ও ঐকতান দেখে বিমোহিত হন। আল্লাহ হলেন মহান জ্যামিতিক। তিনি বেহেশত ও দোজখকে জ্যামিতি দিয়ে গড়ে তুলেছেন। পারস্যে একটি গাছ আছে, যা উট ও ভেড়ার খাবার হিসেবে খুব জনপ্রিয়। এর বীজ…”

এভাবে তিনি একের পর একে জ্যামিতির সৌন্দর্য বর্ণনা করে গেলেন। বণিকদের জায়গা থেকে থেকে দীর্ঘ বালিময় রাস্তা ধরে যেতে যেতে বিজয়সেতুতে পৌঁছলেন তিনি। আমি মুগ্ধতার সাথে তাঁকে নীরবে অনুসরণ করলাম।

আমরা মুয়াজ্জিন চত্বর পার হলাম। জায়গাটার অপর নাম উটচালকদের আশ্রয়স্থল। সাত দুঃখ নামের সরাইখানা নিয়ে আলাপ করলাম আমরা। বেদুইন এবং দামেশক ও মসুলের মুসাফিররা গরম আবহাওয়া থেকে বাঁচতে হরহামেশা এতে আশ্রয় নেয়। এর সবচেয়ে রুচিশীল দিক ছিল ভেতরের উঠোনটা। গরমে এতে ভাল ছায়া পাওয়া যায়। এর চারদিকের দেয়াল লিবিয়ার পাহাড়ে জন্মানো সব ধরনের উদ্ভিদ দিয়ে আচ্ছাদিত। জায়গাটায় এলেই মন স্বস্তি ও শান্তিতে ভরে ওঠে।

কাঠের একটি পুরনো সাইনপোস্ট চোখে পড়ল, যার পাশে বেদুইনরা উট বেঁধে রাখে। পোস্টে লেখা:

সাত দুঃখ সরাইখানা

“সাত দুঃখ, “বেরেমিজ বিড়বিড় করলেন। “কী আশ্চর্য! তোমার কি কোনোভাবে এই সরাইখানার মালিককে চেন?”

“আমি তাকে ভালোভাবেই চিনি।“ উত্তর দিলাম। “সে ত্রিপলির একজন সাবেক দড়ি বেপারি। তার বাবা সুলতান কুরবানের অধীনে চাকরি করত। মানুষ তাকে ত্রিপলীয় বলে ডাকে। তার সরল ও অকপট মনের কারণে সবাই তাকে ভাল চোখে দেখে। ভাল এবং দয়ালু একজন মানুষ। তিনি নাকি একদল সফল সৈনিক নিয়ে সুদান গিয়েছিলেন। আফ্রিকান অঞ্চল থেকে পাঁছজন কৃষ্ণাঙ্গ দাস নিয়ে আসেন। এরা তাঁর অত্যন্ত অনুগত। সুদান থেকে ফিরে তিনি দড়ির ব্যবসা ছেড়ে দেন। পাঁচ দাসকে নিয়ে গড়ে তোলান সরাইখানা।

“দাসগুলোর ছাড়াই তিনি নিজেই দারুণ সৃজনশীল।“ বেরেমিজ বললেন। “তিনি তার সরাইখানার নামের মধ্যে ৭ সংখ্যাটি রেখেছেন। আর মুসলমান, হিন্দু, খৃষ্টান, ইহুদি, পৌত্তলিক—সবার কাছে ৭ একটি পবিত্র সংখ্যা। এটা ৩ ও ৪-এর যোগফল, যারা যথাক্রমে স্বর্গ ও মর্ত্যের প্রতীক। বিভিন্ন বস্তুর সাথে ৭-এর বিস্ময়কর সম্পর্ক আছে:

দোযখের দরজা সাত

দিনের সংখ্যা সাত

গ্রিসে ছিলেন সাত জ্ঞানী

পৃথিবীর বুকে সাগর আছে সাত

গ্রহের সংখ্যা সাত১

পৃথিবীর আশ্চর্য সাত

পবিত্র সংখ্যাটির আরও নানান উদাহরণ দিয়ে যাচ্ছিলেন গণনাকারী। হঠাৎ দেখলাম, সরাইখানার দরজায় দাঁড়িয়ে আছে আমাদের মহান বন্ধু সালিম নাসির। আমাদেরকে ভেতরে যেতে হাত নাড়ছে।

“এই মুহূর্তে আপনাকে পেয়ে আমি কত খুশি তা বলে বোঝাতে পারব না।“ বললেন শেখ। “আমি ও আমার এখানের তিন বন্ধুর জন্যে আপনাকে যেন স্বয়ং আল্লাহ এখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আসুন এখানে। আমরা বড় এক সমস্যায় আছি।“

তিনি আমাদেরকে একটি ছায়াচ্ছন্ন, সেঁতসেঁতে ও উজ্জ্বল বারান্দা দিয়ে ভেতরের উঠোনে নিয়ে আসলেন। এতে পাঁচ কি ছয়টা টেবিল আছে। সেগুলোর একটিতে তিনজন মুসাফির বসা।

শেখ ও গণনাকারীকে দেখে তারা হাত তুলে সালাম দিল। তাদের একজনের বয়স খুব কম। দেখতে লম্বা, হালকা শরীরের। চোখ উজ্জ্বল। মাথায় উজ্জ্বল হলুদ পাগড়ি। পাগড়ির চারদিক সাদা ফিতে দিয়ে বেষ্টিত। পাগড়ির ফিতায় অনিন্দ্য সুন্দর একটি পান্না জ্বলজ্বল করছে। বাকি দুজন গাট্টাগোট্টা। চওড়া কাঁধ। আফ্রিকান বেদুইনদের কালো ত্বক। পোশাক ও বেশভূষা তাদেরকে আলাদা করে রেখেছে। তারা গভীর আলোচনায় ডুবে ছিল এতক্ষণ। বোঝাই যাচ্ছে, কোনো সমধানের অভাবে সবাই হতবুদ্ধি হয়ে আছে।

শেখ তাদেরকে বললেন, “এই হলেন বিখ্যাত হিসাব-রাজা।“ আর বেরেমিজকে বললেন, “এরা তিনজন আমার বন্ধু। এরা দামেশকের মেষপালক। আমার দেখা অন্যতম অদ্ভুত এক সমস্যা তাদের সামনে। বাগদাদে এসে কিছু ভেড়া বিক্রি করে তারা উন্নত মানের কিছু শরবত পেয়েছে। সেগুলো দেওয়া হয়েছে ২১টি একইরকম দেখতে পানপাত্রে:

৭টি পানপাত্র পরিপূর্ণ

৭টি অর্ধপূর্ণ

৭টি একদম খালি

তারা এগুলোকে এমনভাবে ভাগ করতে চায় যাতে সবাই সমান শরবত পায়। পানপাত্রও যাতে সবাই সমানসংখ্যক পায়। পানপাত্রের সংখ্যাকে তো ভাগ করা সহজ। সবাই ৭টি করে পাবে। কিন্তু শরবত না ঢেলে কীভাবে সমানভাবে ভাগ করবে? গণনাকারী বন্ধু, এর কি কোনো সমাধান দেওয়া সম্ভব?”

বেরেমিজ দুই-তিন মিনিট ভাবলেন। তারপর বললেন, “২১টি পাত্রকে সহজেই ভাগ করা যায়। সবচেয়ে সহজ সমাধানটা বলছি আমি।

প্রথমজন পাবেন

তিনটি পূর্ণ পাত্র

একটি অর্ধপূর্ণ পাত্র

তিনটি খালি পাত্র

মোট তাহলে পেলেন সাতটি পাত্র।

দ্বিতীয়জন পাবেন

দুইটি পূর্ণ পাত্র

তিনটি অর্ধপূর্ণ পাত্র

দুইটি খালি পাত্র

ইনিও সাতটি পাত্র পেলেন।

তৃতীয়জনও দ্বিতীয়জনের মতো পাবেন। আমার হিসাব অনুসারে সবাই সাতটি করে পাত্র পেয়েছেন। শরবতও পাবেন সমান পরিমাণ। ধরি প্রতিটি পূর্ণ পাত্র সমান দুই একক। আর অর্ধপূর্ণ পাত্র সমান এক একক। তাহলে আমার বণ্টন অনুসারে প্রথমজন পেলেন

২ + ২ + ২ + ১ + ০ + ০ + ০

মানে মোট ৭ একক।

আবার বাকি দুজন পাবেন

২ + ২ + ১ + ১ + ১ + ০ + ০

এতেও হয় ৭ একক। এতে দেখা গেল, আমার প্রস্তাবিত হিসাব ন্যায়ভিত্তিক হয়েছে। সমস্যাটিকে জটিল মনে হলেও এর সাংখ্যিক হিসাবে জটিলতা নেই।

গণনাকারীর সমাধানকে শেখ ও তিন বন্ধুর সাদরে গ্রহণ করলেন।



চিত্র: ২১টি পানপাত্রকে সবচেয়ে সরলভাবে বণ্টন করার উপায় দেখানো হয়েছে।

“ইয়াল্লা!” পান্নাখচিত পাগড়ি পরা তরুণ লোকটি বলে উঠল। “এই গণনাকারী তো বিস্ময়কর মানুষ। আমাদের কাছে যাকে সবচেয়ে বড় সমস্যা মনে হচ্ছিল তিনি তা নিমিষেই সমাধান করে দিলেন।“ সরাইখানার মালিকের দিকে তাকিয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, “হে ত্রিপলির বাসিন্দা, আমাদের বিল কত হয়েছে?”

“খাবারসহ আপনাদের বিল হয়েছে ৩০ দিনার।“ উত্তর দিলেন মালিক। শেখ নাসির বিল দিতে চাইলেন। কিন্তু দামেশকের মানুষ মানলেন না। এটা নিয়ে কিছুক্ষণ কথাবার্তা ও প্রশংসা বিনিময় হলো। সবাই একযোগে কথা বলে গেল কিছুক্ষণ। শেষ পর্যন্ত ঠিক হলো, অতিথি শেখ নাসির বিল দিতে পারবেন না। তিন বন্ধু ১০ দিনার করে দেবেন। মালিকের সুদানি দাসের হাতে ৩০ দিনার দেওয়া হলো।

একটু পরে দাস ফিরে এসে বলল, “আমার মনিব বলেছেন তিনি একটা ভুল করেছেন। বিল হয়েছে ২৫ দিনার। আপনাদেরকে ৫ দিনার ফিরিয়ে দিতে বলেছেন।

“ত্রিপলির মানুষটা সত্যিই ভাল।“ শেখ নাসির বললেন। পাঁচটি মুদ্রা নিয়ে তিনি তিন বন্ধুর প্রত্যেককে একটি করে মুদ্রা দিলেন। বাকি থাকলে দুটি মুদ্রা। দামেশকের তিন লোকের দিকে এক পলক দৃষ্টি বিনিময় করে তিনি ২টি মুদ্রা তাদেরকে খাবার পরিবেশন করা সুদানি দাসকে বখশিশ দিলেন।

এ সময় পান্নাওয়ালা তরুণটি দাঁড়িয়ে গেলেন। বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বললেন, “৩০ দিনারের বিল দিতে গিয়ে মারাত্মক এক সমস্যা হয়ে গেছে।

“সমস্যা? আমি তো কোনো সমস্যা দেখি না।“ শেখ বিস্মিত।

“আচ্ছা, বলছি।“ দামেশকের বাসিন্দা বললেন। “সমস্যাটা মারাত্মক, তবে দেখে হাস্যকর মনে হবে। একটি দিনার হারিয়ে গেছে। একটু ভাবো। আমাদের সবাই ৯ দিনার করে বিল দিয়েছি। মানে মোট দিয়েছি ২৭ দিনার। এই ২৭-এর সাথে যোগ করলাম শেখ দাসকে যে ২ দিনার বখশিশ দিয়েছেন। তাহলে হলো ২৯ দিনার। আমরা মোট যে ৩০ দিনার দিলাম তার মধ্যে মাত্র ২৯ দিনারের হদিশ মিলল। তাহলে আরেকটি দিনার কোথায়? সেটা কোথায় হারিয়ে গেল?”

শেখ নাসির একটু ভাবলেন। “তুমি তো ঠিকই বলেছ, বন্ধু। তাই তো! প্রত্যেকেই ৯ দিনার দিয়ে থাকলে আর দাস ২ দিনার পেলে তো ২৯ দিনার হয়। মূল ৩০ থেকে ১ দিনার তো নেই।“

বেরেমিজ এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। এবার আর নাক না গলিয়ে পারলেন না। শেখকে বললেন, “আপনি ভুল করছেন। হিসাব এভাবে করা ভুল। ত্রিপলির লোকটাকে দেওয়া হয়েছিল ৩০ দিনার। ২৫ দিনার তার কাছেই থাকল। ৩ দিনার তিন বন্ধুর কাছে ফেরত গেছে। ২ দিনার দাস বখশিশ পেয়েছে। কিছুই হারায়নি। হিসাবেও কোনো গড়বড় নেই। তিন বন্ধুর মোট ২৭ দিনার খরচের ২৫ দিনার পেয়েছেন মালিক আর ২ দিনার পেয়ছে দাস।“

বেরেমিজের ব্যাখ্যা২ শুনে দামেশকের তিন বন্ধু হাসিতে ফেটে পড়ল, “এই গণনামানব হারানো দিনারের রহস্যও বের করলেন। সরাইখানার মানও রক্ষা করেছেন। আল্লাহর শুকরিয়া।“

অনুবাদকের নোট

১। সে সময় জানা গ্রহের সংখ্যা সাত ছিল। তবে বর্তমানে আট। যদিও প্লুটোকে অনেকদিন পর্যন্ত গ্রহ বলায় ৯টি ছিল অনেকদিন পর্যন্ত।

২। ব্যাপারটাকে আরেকটু ব্যাখ্যা করা যাক। শেখ নাসির ও তার বন্ধুটি যে ২৭-এর সাথে ২ যগ করলেন সেটা আসলে ভিন্ন রকম সংখ্যাকে যোগ করা হয়েছে। গত অধ্যায়ের ভুল যোগটির মতো। ৫টি আম আর ২টি লিচুকে যোগ করলে কয়টি আম হয় বলা অযৌক্তিক। বললে আলাদাভাবেই বলতে হবে: ৫টি আম ও ২টি লিচু।

০৯

শিক্ষকের শিক্ষক

কবি শেখ ইয়াজিদের সাথে সাক্ষাৎ। একজন জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণীর অদ্ভুদ ফলাফল। একজন কিশোরীকে গণিত পড়ানোর প্রস্তাব পেলেন বেরেমিজ। বেরেমিজ তাঁর বন্ধু ও মনিব জ্ঞানী ইলিম সম্পর্কে বলছেন।

মহররম মাসের শেষ সূর্যোদয়। বিখ্যাতি কবি ইয়াজিদ আব্দুল হামিদ আমাদেরকে খুঁজতে মুসাফিরখানায় এলেন।

“নতুন কোনো সমস্যা নাকি?” বেরেমিজ হেসে জিজ্ঞেস করলেন।

“ঠিকই ধরেছেন, বন্ধু। “কঠিন এক সমস্যায় পড়েছি। আমার তেলাসসিম নামে একটি মেয়ে আছে। ওর বুদ্ধিমত্তা অনেক বেশি। পড়াশোনায়ও ব্যাপক আগ্রহ। আমি চাই ও সংখ্যার বৈশিষ্ট্য ও তাদের বিভিন্ন কার্যকরী সম্ভাবনা সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করুক। কিন্তু সংখ্যা ও হিসাবের দক্ষতা অর্জন করতে হলে আল-খাওয়ারিজমির বিজ্ঞান, মানে গণিত জানতে হবে। এ কারণে আমি ঠিক করেছি তেলাসসিমের ভবিষ্যৎকে সুখময় করতে তাকে জ্যামিতি ও ক্যালকুলাসের রহস্য শেখাব।“

নম্র শেখ একটু থামলেন। এরপর বললেন, “আমি দরবারে অনেক পণ্ডিত খুঁজেছি। কিন্তু সতের বছর একটি মেয়েকে জ্যামিতি পড়ানোর মতো কাউকে পাইনি। তাদের মধ্যে অত্যন্ত প্রতিভাধর একজন পণ্ডিত আমাকে উল্টো বললেন, “আপনি কি জিরাফকে গান শেখাতে চাইবেন? এর স্বরতন্ত্রী ন্যূনতম শব্দটিও করতে পারে না। এটা হবে সময়ের মারাত্মক অপচয়। পণ্ডশ্রম। জিরাফ কখনোই গান গাইবে না।

আর নারী মস্তিষ্কও তো জ্যামিতির প্রাথমিক নিয়মগুলোই বুঝবে না। এই অনন্য বিজ্ঞানটি যুক্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। ব্যবহার করতে হয় নানান রকম সমীকরণ। এছাড়াও যুক্তি ও অনুপাত ব্যবহার করে বিভিন্ন নীতিমালা প্রয়োগ করতে হয়। বাবার হেরেমে আবদ্ধ একটি মেয়ে কীভাবে বীজগণিতের সূত্র ও জ্যামিতির উপপাদ্য শিখবে? কখনোই না। একটি তিমিও মক্কায় হজ্ব করতে যাওয়ার চেয়ে একটি মেয়ের গণিত শেখা কঠিন। কেন অসম্ভব নিয়ে মেতে আছেন? দুর্ভাগ্য যদি এসেই যায়, তাকে আল্লাহর ইচ্ছা বলে মেনে নিন।“

এ মুহূর্তে শেখ খুব গম্ভীর। কুশন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে এপাশ-ওপাশ হাঁটলেন একটু। একটু পর আরও বিষণ্ন হয়ে বললেন, “এসব কথা শুনে আমার মনোবল ভেঙে গিয়েছিল। তবে একদিন বন্ধু সালিম নাসিরের কাছে বাগদাদে আসে পারস্যের এক গণিতবিদ সম্পর্কে অনেক কথা শুনলাম। খুব বিস্তারিত শুনলাম আট রুটির গল্প। অনেক মুগ্ধ আমি। তাই গণনাকারী খুঁজে পেতে আমি বের হয়ে পড়লাম। তাঁকে খোঁজার জন্যে উজির মালুফের বাসায়ও গিয়েছি। ২৫৭টি উটের সমস্যা তিনি কত সৃজনশীল উপায়ে সমাধান করেছেন দেখে আমি অভিভূত হয়ে যাই। অপূর্ব উপায়ে তিনি ২৫৭টির বদলে ২৫৬টি উটের প্রস্তাব দেন। আপনাদের মনে আছে না?”

শেখ ইয়াজিদ মাথা তুলে শ্রদ্ধার সাথে গণনাকারীর দিকে তাকালেন, “হে বন্ধু, আপনি কি আমার মেয়ে তেলাসসিমকে গণিতের কৌশলগুলো শেখাতে পারবেন? আপনি যত বিনিময় চান আমি দেব। আপনি উজির মালুফের সচিবের দায়িত্ব পালন করেও পড়াতে পারবেন।”

“শ্রদ্ধেয় শেখ, “বেরেমিজ সাথে সাথে জবাব দিলেন, “আপনার সুন্দর প্রস্তাব ফিরিয়ে দেওয়ার কোনো কারণ পাচ্ছি না। কয়েক মাসের মধ্যে আমি আপনার মেয়েকে বীজগণিত ও জ্যামিতির রহস্য শিখিয়ে দিতে পারি। মহিলাদের বুদ্ধিবৃত্তিক সক্ষমতা সম্পর্কে দার্শনিকরা মারাত্মক ভুলের মধ্যে আছেন। সঠিক নির্দেশনা পেলে নারীদের বুদ্ধিমত্তাও বিজ্ঞানের সৌন্দর্য ও রহস্য আয়ত্ত করতে পারবে। তথাকথিত সেসব পণ্ডিতদের ধারণার ভুল সহজেই প্রমাণ করে দেওয়া যাবে। ইতিহাসে মহিলাদের গণিতে দক্ষতার অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। যেমন আলেক্সান্দ্রিয়ার হাপেশিয়ার কথা বলা যায়। যিনি শত শ্ত মানুষকে গাণিতিক বিজ্ঞান শিখিয়েছিলেন। ডায়াফ্যান্টাসের কাজের ওপর একটি বিশ্লেষণ লিখেছেন। অ্যাপোলোনিয়াসের কঠিন কঠিন লেখার বিশ্লেষণ লিখেছেন। বর্তমানে ব্যবহৃত জ্যোতির্বিজ্ঞানের সারণি সংশোধন করেছেন। শেখ, ভয় পাবেন না। অনিশ্চয়তায়ও ভুগবেন না। আপনার মেয়ে পিথাগোরাসের জ্ঞান সহজেই আয়ত্ত করবে। আল্লাহর জন্য সমস্ত প্রশংসা। এখন ঠিক করতে হবে কবে কখন পড়ানো শুরু করব।“

ইয়াজিদ সাহেব বললেন, “যত দ্রুত সম্ভব! তেলাসসিমের বয়স সতেরো হয়ে গেছে। ও, আপনাকে একটি বিষয় বলে দেই। আমার মেয়ে হেরেমেই থাকে। আজ পর্যন্ত ও আমাদের পরিবারের বাইরে কারও সাথে কথা বলেনি। সে গণিতের ক্লাস করবে পর্দার ওপাশ থেকে। তার চেহারা ঢাকা থাকবে। দুজন দাস আশেপাশে থাকবে। এসব শর্তে আপনার আপত্তি নেই তো?”

“আনন্দের সাথেই মেনে নিচ্ছি।“ বেরেমিজ উত্তর দিলেন। “একটি মেয়ের সম্ভ্রম ও শালীনতা বীজগণিতের সূত্রের চেয়ে বেশি মর্যাদা রাখে। দার্শনিক প্লেটোর স্কুলের দরজায় লেখা ছিল

জ্যামিতির জ্ঞান না থাকলে এই দরজা দিয়ে প্রবেশ করা যাবে না।

একদিন নষ্ট চরিত্রের এক যুবক প্লেটোর স্কুলে আসল। কিন্তু তিনি তাকে ভর্তি করাতে অস্বীকৃতি জানালেন। বললেন, ‘জ্যামিতি সরল ও বিশুদ্ধ। এমন বিশুদ্ধ বিজ্ঞান তোমার নোংরামীর কাছে নিরাপদ নয়।‘

এভাবেই সক্রেটিসের বিখ্যাত ছাত্র দেখিয়ে দিলেন, গণিত আর নোংরামী সমান্তরালে চলে না। অশ্লীলতার সাথে মিশ্রিত করলে এর সম্মান নষ্ট হয়। আমার কাছে অচেনা আপনার মেয়েকে আমি আনন্দের সাথেই পড়াব। তাকে আমি চিনি না। তার চেহারাও আমার দেখার দরকার হবে না। আল্লাহ চাহে তো আমি কালই শুরু করতে পারব।“

“আচ্ছা ঠিক আছে,“ বললেন শেখ। “জোহরের সালাতের কিছু পরে আমার একজন দাস আপনাকে নিয়ে আসতে যাবে। আল্লাহ হাফেজ।“

শেখ ইয়াজিদ চলে গেলে আমি গণনাকারীকে বললাম কাজটা মনে হয়ে তার জন্য ঠিক হবে না। তাঁকে বললাম, “যেখানে আপনি জীবনে কোনোদিন বই পড়েননি বা পণ্ডিত ব্যক্তিদের পাঠচক্রে যাননি, সেখানে কীভাবে একজন কিশোরীকে আপনি গণিত পড়াবেন? আপনি যে সুন্দর ও প্রাসঙ্গিকভাবে হিসাব-নিকাশের ক্ষমতাকে কাজে লাগান তা কীভাবে শিখেছেন? আমি ভালোভাবে জানি, আপনি মেষপালক থাকার সময় ভেড়া, ডুমুর গাছ ও উড়ন্ত পাখির ঝাঁক থেকে গণনার রহস্য রপ্ত করেছেন…”

“বন্ধু, ভুল হচ্ছে তোমার।“ বেরেমিজ শান্ত স্বরে উত্তর দিলেন। পারস্যে আমার মনিবের মেষ দেখাশোনার সময় ইলিম নামে একজন দরবেশকে একবার ভয়াবহ ধুলিঝড়ের সময় আমি তার প্রাণ রক্ষা করি। সে থেকে তিনি আমার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে গেলেন। তিনি একজন জ্ঞানী মানুষ ছিলেন। তাঁর কাছ থেকে আমি প্রয়োজনীয় ও দারুণ সব জিনিস শিখি। এমন একজন মানুষের শিষ্য হওয়ায় আমি জ্যামিতি পড়াতে পড়াতে আলেক্সান্দ্রিয়ার ইউক্লিডের শেষ বইটি পর্যন্ত যেতে পারব।

১০

হাতে পাখি

আমাদের ইয়াজিদের প্রাসাদে গমন। বদমেজাজি তারা তির বেরেমিজের হিসাবকে সন্দেহের চোখে দেখে। খাঁচার পাখি ও পারফেক্ট সংখ্যারা। গণনাকারী শেখের দয়ার প্রশংসা করেন। আমি একটি কোমল ও সুরেলা গান শুনি।

বিকাল চারটার কিছু পরে আমরা সরাইখানা থেকে বের হয়ে ইয়াজিদ আব্দুল হামিদের বাড়ির পথ ধরলাম। ভদ্র ও বুদ্ধিমান একজন দাস আমাদের সাথে। মুয়াসসান এলাকার রাস্তার সমীরণ গায়ে লাগিয়ে আমরা এগুচ্ছি। একটি পার্কের কেন্দ্রে অবস্থিত চমৎকার এক বাসভবনে পৌঁছলাম আমরা।

ইয়াজিদের বাড়ির সৌন্দর্যে বেরেমিজ বিস্মিত হলেন। পার্কের কেন্দ্রে ছিল রূপার একটি টাওয়ার। সূর্যের আলোরা সেখানে রংধনু সৃষ্টি করেছে। একটি বড় উঠোন পেরিয়ে লোহার গেটের ওপাশে প্রধান বাসভবন। চমৎকার কারুকাজ করা গেটে। ভেতরে রয়েছে আরও একটি উঠোন। এই উঠোনের কেন্দ্রে রয়েছে একটি দারুণ সাজানো-গোছানো বাগান। ভেতরের উঠোন বাসাকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছে। একটিতে রয়েছে শোবার ঘরগুলো। অন্য পাশে রয়েছে উন্মুক্ত কক্ষগুলো। আর আছে অভ্যর্থনা কক্ষ, যাতে শেখ দার্শনিক, কবি ও মন্ত্রীদের সাথে আড্ডা দেন।

সাজানো-গোছানো হলেও শেখের প্রাসাদকে মলিন ও বিষণ্ন লাগছিল। গ্রিলের জানালা দিয়ে ভেতরে না তাকালে কল্পনাই করা যাবে না কত সুন্দর শৈল্পিক জিনিস সাজিয়ে রাখা হয়েছে। ভবনের দুইটি অংশ একটি লম্বা গ্যালারি দিয়ে যুক্ত। শ্বেত মার্বেল পাথরের চিকন দশটি পিলার গ্যালারিকে ধরে রেখেছে। পিলারের ফাঁকে ফাঁকে চতুষ্কোণ ভিত্তির উপর অশ্বখুরাকৃতির খিলান। আর মেঝেটা মোজাইক নির্মিত। এখান থেকে দুটি শ্বত পাথরেরই দুটি সিঁড়ি একটি বাগানের দিকে নেমে গেছে। বাগানের পুকুরটির পাড়ে সব রং ও গন্ধের ফুল লাগানো রয়েছে। বাগানে একটি বড় পাখির খাঁচাও দেখা যাচ্ছে। এটাও মোজাইক দিকে সাজানো। এটিই যেন বাগানের মূল আকর্ষণ। অদ্ভুত ডাকের ও প্রজাতির এবং উজ্জ্বল পালকবিশিষ্ট পাখি আছে খাঁচায়। অপরূপ সুন্দর কিছু পাখি আমার অচেনা প্রজাতির।

মেজবান বাগান থেকে বেরিয়ে আমাদেরকে আন্তরিকভাবে অভিবাদন জানালেন। সাথে একজন কালো, চিকন ও চওড়া বুকের যুবক। বোঝা গেল, তার মধ্যে সৌজন্যবোধের অভাব আছে। কব্জির খঞ্জর নিয়ে আনমনেই খেলছে সে। খঞ্জরের মুষ্ঠি হাতির দাঁত দিয়ে তৈরি। তার কথা বলার তীক্ষ্ণ, আগ্রাসী, রূঢ় ল কর্কশ ভাবটা সবচেয়ে বেশি বিশ্রী লাগে।

“এই লোকই কি আপনার সেই গণনাকারী?” তার কণ্ঠ অবজ্ঞা ঝরে পড়ল। “ইয়াজিদ, তুমি মানুষকে এত সহজে বিশ্বাস করে ফেল! তুমি রাস্তার ভিখারিকে সুন্দরী তেলাসসিমের সাথে কথা বলার সুযোগ করে দিচ্ছ? এর কোনো অর্থ হয় না। হায় আল্লাহ! কেমন একটা কাঁচা লোক তুমি!” তার কণ্ঠে বিশ্রী হাসি।

তার ধৃষ্টতা আমাকে রাগিয়ে দিল। এক ঘুসি মেরে হতভাগার রূঢ়তার জবাব দিয়ে দিতে ইচ্ছে হচ্ছিল। বেরেমিজ কিন্তু একদম শান্ত। কে জানে? হয়তো বা গণনাকারী এই পরিস্থিতির মধ্যেও, এই অপমানের মধ্যেও আরেকটি সমস্যা পেয়ে গেছে সমাধানের জন্যে।

কবি এই লোকটির আচরণে বিব্রত হলেন। বললেন, “হে গণিতবিদ, দয়া করে আমার চাচাত ভাই তারা তিরের কর্কশ আচরণকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। ও আপনার গাণিতিক জ্ঞান সম্পর্কে জানে না। তাই বুঝতে পারছে না। সেও তেলাসসিমের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন।

“হ্যাঁ, আমি এই আগন্তুকের গাণিতিক দক্ষতা সম্পর্কে জানি না। খাবার ও আশ্রয়ের সন্ধানে কত উট বাগদাদের উপর দিয়ে চলে যায় তা জেনে আমি কী করব?” লোকটি বলল। এরপর ধীরে ধীরে হাঁটতে হাঁটতে ঘনঘন কথা বলতে লাগল, “ভাই, কয়েক মিনিটেই আমি প্রমাণ করে দিতে পারব তুমি এই অভিযাত্রী সম্পর্কে কত ভুলের মধ্যে আছ। তুমি অনুমতি দিলে আমি এই লোকের বিজ্ঞানের দৌড় থামিয়ে দিতে পারি। এ জন্য মসুলের এক পণ্ডিতের কাছে শেখা সামান্য কিছু কৌশলই যথেষ্ট।“

“আচ্ছা, ঠিক আছে। অনুমতি দিলাম।“ ইয়াজিদ মেনে নিলেন। “তুমি এখনই গণনাকারীকে প্রশ্ন করতে পারো বা কোনো সমস্যা উত্থাপন করতে পারো।“

“সমস্যা? কী জন্যে? তুমি কি খাঁচায় আবদ্ধ শিয়ালের জ্ঞানকে জ্ঞানীদের বিজ্ঞানের সমতুল্য মনে কর?” লোকটির ব্যাঙ্গাত্মক প্রতিক্রিয়া। আমি তোমাকে নিশ্চিত করতে পারি, এই অজ্ঞ দরবেশের মুখোশ খুলে দিতে কোনো সমস্যা উত্থাপন করার দরকার নেই। ফলাফল দেখানোর জন্যে আমি আমার মস্তিষ্ককে কষ্ট দেব না। দ্রুতই বলছি।“

বেরেমিজের দিকে শীতল ও কঠোর দৃষ্টি দিয়ে সে পাখির বড় খাঁচার দিকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, “হে পাখি গণনাকারী, বলো এই খাঁচায় কয়টা পাখি আছে?”

বেরেমিজ এক হাত আরেক হাতে রেখে বুকে রাখল। গভীর মনোযোগ দিয়ে খাঁচার ভেতরের এতগুলো পাখি দেখতে লাগল। আমার কাছে মনে হলো, খাঁচার মধ্যে উড়ে বেড়ানো এতগুলো পাখি গোণার চেষ্টা করা পাগলামি ছাড়া কিছুই নয়। পাখিগুলো প্রতি মুহূর্তে বসার জায়গা পরিবর্তন করছে।

সুনসান নীরবতা। কয়েক সেকেন্ড পরে গণনাকারী ইয়াজিদের দিকে ফিরলেন, “শেখ, আমার অনুরোধ, তিনটি পাখি এখুনি ছেড়ে দেওয়া হোক। তাহলে মোট সংখ্যা বলা সরল ও মজার হবে।“

তাঁর অনুরোধকে নিছক বোকামি মনে হলো। যুক্তি বলে যে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক পাখি গুণতে পারবে, সে তিনটা বেশি পাখিও গুণতে পারবে। এ অনুরোধ ইয়াজিদকে কৌতূহলী করে তুলল। তিনি খাঁচার রক্ষককে বেরেমিজের কথামতো পাখি ছাড়তে আদেশ দিলেন। মুক্ত হয়েই তিনটি হামিং বার্ড (গুঞ্জনপাখি) তীরের মতো আকাশের দিকে ছুটে গেল।

“এখন, “ বেরেমিজ সতর্ক ভঙ্গিতে বললেন, “খাঁচায় ৪৯৬টি পাখি আছে।“

“অপূর্ব!” ইয়াজিদের কণ্ঠে তীব্র উৎসাহ। “একদম সঠিক। তারা তিরও তা জানে। আমি তাকে বলেছি এখানে ৫০০টি পাখি ছিল। একটি নাইটিংগেইল আমি মসুল পাঠিয়েছি। তিনটি পাখি মুক্ত। বাকি থাকল ৪৯৬।“

“ভাগ্যক্রমে আন্দাজে বলা সংখ্যাটা মিলে গেছে।“ কণ্ঠে অসন্তোষ নিয়ে বিড়বিড় করল তারা তির।

কৌতূহলী ইয়াজিদ জিজ্ঞেস করলেন, “আপনি ৪৯৬কে কেন বেছে নিলেন? সাথে ৩ যোগ করে ৪৯৯ বলাই কি সহজ হত না?”

“আমি ব্যাখ্যা করছি, শেখ।“ বেরেমিজ উত্তর দিলেন। “গণিতবিদরা সবসময় মজার সংখ্যা পছন্দ করেন। আর সাদামটা ও নিরস সংখ্যা এড়িয়ে চলেন। ৪৯৯ ও ৪৯৬-এর পার্থক্য অল্পই। ৪৯৬ একটি পারফেক্ট বা নিখুঁত সংখ্যা। এ কারণেই একে আমি বেছে নিয়েছি।“

“নিখুঁত সংখ্যা দ্বারা আপনি কী বোঝাচ্ছেন? কিসে একটি সংখ্যাকে নিখুঁত করে তোলে?”

“নিখুত সংখ্যা হলো, “বেরেমিজ বললেন, “যে তার নিজে ছাড়া বাকি উৎপাদকগুলোর যোগফলের সমান হয়। যেমন ধরুন ২৮ এর নিজে ছাড়া বাকি উৎপাদকগুলো হলো ১, ২, ৪, ৭ ও ১৪। এদের যোগফল ২৮। তাহলে ২৮ একটি নিখুঁত সংখ্যা। ৬ সংখ্যাটিও নিখুঁত। ১ + ২ +৩ = ৬। ৬ ও ২৮ ছাড়াও ৪৯৬ও একটি নিখুঁত সংখ্যা।“

বদমেজাজি তারা তির বেরেমিজের ব্যাখ্যা আর সহ্য করতে পারল না। শেখ ইয়াজিদকে বলে রাগে গজর গজর করতে করতে বিদায় নিল। গণিতবিদের কাছে শোচনীয় পরাজয়ের চিহ্ন তার পায়ের ধুলিতে।

“আমি আবারও অনুরোধ করছি,” ইয়াজিদ সাহেব বললেন, “আমার ভাই তারা তিরের কথায় কষ্ট পাবেন না। ও খুব বদমেজাজি। আল দারিদের লবণের খনির দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে ও খিটখিটে ও কর্কশ হয়ে গেছে। তিনবার তাকে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে। দাসরা অনেকবার তার ওপর হামলা করেছে।“

বোঝাই যাচ্ছিল বিচক্ষণ বেরেমিজ শেখকে অসুবিধায় ফেলতে চাচ্ছিলেন না। তিনি বিনয় ও উদারতার সাথে বললেন, “প্রতিবেশীদের সাথে শান্তিতে বাস করতে হলে রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। বন্ধুভাবাপন্ন আচরণ করতে হয়। অপমানিতবোধ করলে আমি সুলাইমানের (আঃ) মতো বিচক্ষণ আচরণ করার চেষ্টা করি: “বোকার রাগ তাৎক্ষণিকভাবে বোঝা যায়, কিন্তু একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি অপমান হজম করে নেয়” (বুক অব প্রোভার্ব ১২:১৬)। আমি কখনও আমার হৃদয়বান বাবার শিক্ষা ভুলব না। যখনই তিনি আমার মধ্যে ক্ষোভ ও প্রতিশোধপরায়ণতা দেখতেন, বলতেন, ‘যে সঙ্গী-সাথীদের সাথে নম্র আচরণ করে, আল্লাহ তাকে সম্মানীত করেন।‘ “

একটু থেমে তিনি বললেন, “তবে আমি অহঙ্কারী তারা তিরের কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। আমি তার কল্যাণ কামনা করি। তার রুঢ় আচরণের ফলে আমি নতুন করে একটা কল্যাণমূলক কাজের চর্চার সুযোগ পেয়েছি।“

“নতুন কল্যাণমূলক কাজ?” শেখ অবাক। “কী বলছ?”

“একটি পাখি মুক্তি করলেই” বেরেমিজ জবাব দিলেন, “আমরা তিনটি কল্যাণমূলক কাজ করি। প্রথমটা হলো পাখিকে মুক্ত করে স্বাধীন করে দেওয়া। দুই আমাদের বিবেককে মুক্ত করা। আর তৃতীয়ত আল্লাহর প্রতি…“

“তাহলে তুমি বলছ আমি সবগুলো পাখি মুক্ত করে দিলে…”

“শেখ, আমি বলব,” বেরেমিজ উত্তেজিত হয়ে বললেন, “আপনি ১৪৮৮টি অতি উত্তম কল্যাণের কাজ করবেন।“ যেন তিনি অবচেতনভাবেই জানতেন ৪৯৬ ও ৩-এর গুণফল ১৪৮৮।

ইয়াজিদ অত্যন্ত মুগ্ধ হলেন তাঁর কথায়। তখনই ঠিক করলেন বিশাল খাঁচার সব পাখি ছেড়ে দিবেন। নির্দেশ শুনে দাস ও চাকররা হতবাক হয়ে গেল। দীর্ঘ দিনের প্রচেষ্টা ও ধৈর্য্যের ফসল পাখিগুলোর মূল্য ছিল অনেক। ছিল তিতির পাখি, হামিং বার্ড, উজ্জ্বল লম্বা লেজের ফিজেন্ট, কালো শঙ্খ ছিল, মাদাগাস্কারের হাস, ককেশীয় পেঁচা, চীন ও ভারতের কিছু দুর্লভ আবাবিল পাখি।“

“মুক্ত করে দাও।“ অপূর্ব সুন্দর আংটিসহ হাতখানা দুলিয়ে শেখ চিৎকার করে বলে উঠলেন।

বিশাল দরজাগুলো নড়ে উঠল। পাখিরা ঝাঁকে ঝাঁকে খাঁচা ছাড়ল। বাগানের গাছের ডালে গিয়ে বসল কিছু কিছু।

বেরেমিজ তারপর বললেন, “পাখা ছড়িয়ে রাখা প্রতিটি পাখি এক একটি বই, যার পৃষ্ঠাগুলো আকাশের বুকে উন্মুক্ত। পাখি বন্দী করা মানে আল্লাহর বইয়ের লাইব্রেরি ডাকাতি বা ধ্বংস করার মতো জঘন্য অপরাধে লিপ্ত হওয়া।“

আমরা এই প্রথম একটা গানের ধ্বনি শুনলাম। কণ্ঠটা ছিল অসাধারণ কোমল ও চিকন। আবাবিলের হালকা কিচিরমিচির ও ঘুঘুর কূজনের সাথে তা মিশে গেল। মোহনীয় ও বিষণ্ন সুরে গান শুরু হলো। যেন কোনো নিঃসঙ্গ নাইটিংগেইলের শোকগাঁথা। ধীরে ধীরে গানের গলা চড়া ও কড়া হলো। বিকেলের শান্ত পরিবেশের সাথে গানের বিষণ্নতাকে বেমানান লাগছিল। বাতাস যেভাবে পাতা উড়িয়ে নেয় সেভাবেই যেন গানের কলিকেও ভাসিয়ে বেড়াচ্ছিল। গানের কণ্ঠ আবার পূর্বের শোকের সুর ধারণ করল। যেন বাগানের মধ্যে কেউ ফিসফিস করে বলছিল:

আমার কণ্ঠ হয় যদি গায়কের মতো

অথবা ফেরেশতার

আর আমার মধ্যে যদি দয়া না থাকে

তাহলে আমার কণ্ঠ হবে

তামা বা পিতলের ঝন ঝনের মতো

আমি শূন্য

আমি শূন্য

আমার যদি ভবিষ্যতের জ্ঞানও থাকে,

আমি যদি জানি সব রহস্য, সব জ্ঞান,

আমি যদি পাহাড়ও টলাতে পারি,

আর আমার মধ্যে যদি দয়া না থাকে,

আমি শূন্য

আমি শূন্য

আমি যদি নিজেকে উড়াজ করে

আমার সব সম্পদ

গরীবকে বিলিয়ে দেই

আর আমার মধ্যে যদি দয়া না থাকে,

আমি শূন্য

আমি শূন্য

কণ্ঠের মোহনীয়তা আমাদের চারপাশকে আনন্দঘন করে তুলেছিল, যা বলে বোঝানো যাবে না। বাতাসও যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

“তেলাসসিম গান গাচ্ছে।“ আমাদেরকে মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনতে দেখে বললেন শেখ।

পাখিরা দূরে উড়ে যাচ্ছিল। বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে মুক্তির গান। ৪৯৬টি পাখি তো নয়, যেন মনে হচ্ছিল হাজার হাজার।

বেরেমিজ চুপচাপ। গানের সুর তার চেতনায় মিশে গেছে। গানের সুর বাড়িয়ে দিয়েছিল পাখিদের মুক্তিতে আনন্দকে।

জিজ্ঞেস করলেন, “এই গান কে লিখেছে?”

শেখ বললেন, “আমি জানি না। এক খৃষ্টান দাস তাকে এটা শিখিয়েছে। এরপর থেকে সে এটা ভুলতেই পারছে না। এটা কোনো নাজরানী কবির লেখা হয়ে থাকবে। আমার স্ত্রী আমাকে এটা বলেছেন।

১১

সঠিক পরিমাপের লক্ষ্যে

বেরেমিজ যেভাবে গণিত পড়ানো শুরু করলেন। প্লেটোর একটি কথা। আল্লাহর একত্ববাদ। পরিমাপ মানে কী? গণিতের বিভিন্ন অংশ। পাটিগণিত ও সংখ্যাতত্ত্ব। বীজগণিত ও অন্বয় (সম্পর্ক)। জ্যামিতি ও আকৃতি। গতিবিদ্যা ও জ্যোতির্বিজ্ঞান। রাজা আসাদ আবু কারিবের স্বপ্ন। আল্লাহর কাছে ‘অদৃশ্য’ শিক্ষার্থীর দোয়া।

বেরেমিজের পড়ানোর কক্ষটা বেশ বড়সড়। ছাদ থেকে মেঝে পর্যন্ত ঝোলানো লাল মখমলের মোট ও ভারী পর্দা কক্ষকে দুই ভাগ করেছে। ছাদ উজ্জ্বল রং করা। পিলারগুলো সোনা-খচিত। গালিচার ওপর রেশমের বড় বড় কুশন ছড়িয়ে রয়েছে। কুশনের কিনারে কুরআনের আয়াত লেখা। দেয়ালগুলো সুন্দর নীল নকশায় সজ্জিত। মরুকবি আন্তারের কবিতার সুন্দর সুন্দর চরণ সেখানে লেখা। কক্ষের মধ্যখানে দুই পিলারের মাঝে নীল ব্যাকগ্রাউন্ডে স্বর্ণাক্ষরে আন্তারের একটি বিজয়-সঙ্গীতের দুটি লাইন লেখা:

আল্লাহ তাঁর কোনো বান্দাকে ভালবাসলে

তাকে প্রেরণায় সিক্ত করেন

ধূপ ও গোলাপের গন্ধ পুরো ঘরে ছড়িয়ে রয়েছে। ওদিকে সন্ধ্যা নামছে। মর্মর পাথরের পালিশ করা জানালা খোলা। জানালা দিয়ে বাইরের বাগানের সুন্দর আপেল গাছের সারি দেখা যাচ্ছে। পাশেই বইছে ধূসর নদীর রুক্ষ স্রোত। দরজার কাছে একজন কৃষ্ণাঙ্গ দাসী দাঁড়িয়ে। চেহেরা উন্মুক্ত। হাতের আঙ্গুলে মেহেদি দেওয়া।

“আপনার মেয়ে আছে?” শেখ বেরেমিজকে জিজ্ঞেস করলেন।

“হ্যাঁ, অবশ্যই,” শেখ উত্তর দিলেন। “আমি তাকে কক্ষের অন্যপাশে পর্দার আড়ালে বসতে বলেছি। ও ওখান থেকে দেখতে ও শুনতে পাবে। তবে এপাশ থেকে ওকে দেখা যাবে না।“

সত্যিই সবকিছু এমনভাবে সাজানো হয়েছে যাতে বেরেমিজের ছাত্রী কিশোরী মেয়েটির ছায়াও দেখা না যায়। মেয়েটি হয়ত মখমলের কোনো ছোট্ট ছিদ্র দিয়ে আমাদের দেখছে, যা আমরা বুঝতে পারছি না।

“আমার মনে হয়,” শেখ আবেগের সাথে বললেন, “এখন শুরু করা যেতে পারে। মা তেলাসসিম, মনযোগ দেওয়ার চেষ্টা করো।“

“জি, বাবা।“ ওপাশ থেকে ভেসে এস একটি অভিজাত কণ্ঠ।

বেরেমিজ পাঠ শুরু প্রস্তুতি নিলেন। দুই পা আড়াআড়ি করে কক্ষের মাঝে একটি কুশনে বসলেন। আমিও কক্ষের কোণায় সুবিধামতো একটি জায়গায় আরাম করে বসলাম। শেখ বসলেন আমার পাশে।

বিজ্ঞানও শুরু হয় প্রার্থনা দিয়ে। বেরেমিজও তাই করলেন: “পরম করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করছি। সমস্ত প্রশংসা মহাবিশ্বের সর্বশক্তিমান স্রষ্টার জন্যে। আল্লাহর করুণাই আমাদের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। আমরা আপনারই উপাসনা করি। আপনার করুণা কামনা করি। আমাদেরকে সুপথে পরিচালিত করেন, যে পথে চলেছেন আপনার আশীর্বাদপুষ্টরা।“

প্রার্থনা শেষ করে বেরেমিজ বললেন, “রাতের নীরব পরিষ্কার আকাশের দিকে তাকালে আমরা অনুভব করি, আল্লাহর বিস্ময়কয় সৃষ্টি উপলব্ধি করার সাধ্য আমাদের নেই। আমাদের বিস্মিত চোখে তারকারা যেন এক উজ্জ্বল কাফেলা, যারা চলছে এক অসীম মরুভূমি ধরে। ঘুরে বেড়াচ্ছে অসংখ্য নীহারিকা, গ্রহ। মেনে চলছে চিরন্তন নিয়ম। মহাকাশের গভীর থেকে গভীরে চিন্তা করলে একটি ধারণাই ভেসে আসে: সর্বত্র সংখ্যার জয়জয়কার।

“গ্রিকরা যখন দেব-দেবীর পূজা করত সে সময়ের কথা। পিথাগোরাস নামে একজন দার্শনিকের জন্ম হলো। আল্লাহ কত জ্ঞানী! একজন শিষ্য পিথাগোরাসকে জিজ্ঞেস করলেন, মানুষের কাজকর্মে সবচেয়ে প্রভাবশালী নিয়ামক কী, তিনি উত্তর দিলেন, ‘সংখ্যাই সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছে।‘

“সত্যিই, সবচেয়ে সরল চিন্তাটিও অনেক ক্ষেত্রেই সংখ্যার মৌলিক ধারণা ছাড়া অসম্ভব হয়ে ওঠে। মরুর বেদুইন প্রার্থনায় মাথা ঝুঁকিয়ে আল্লাহকে ডাকে। তার চেতনা জুড়ে থাকে একটি সংখ্যা: এক ও একত্ববাদ। হ্যাঁ, পবিত্র গ্রন্থ ও নবীর কথা অনুসারে আল্লাহ এক, চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী। ফলে আমাদের বুদ্ধির কাঠামোতে স্রষ্টার প্রতীক হিসেবে সংখ্যারা মিশে আছে।

“সকল যুক্তি ও জ্ঞানের ভিত্তি হলো সংখ্যা। সংখ্যা থেকেই আসে আরেকটি সার্বজনীনভাবে গুরুত্বপূর্ণ ধারণা: পরিমাপ।

“পরিমাপ করতে হলে তুলনা করতে হয়। শুধু সে সংখ্যাগুলোই পরিমাপ করা যায় যেগুলোতে তুলনা করার কোনো উপাদান থাকে। মহাশূন্যের বিশালতাকে কি পরিপাম করা সম্ভব? একদম না। মহাশূন্য অসীম। ফলে নেই তুলনার কোনো মাপকাঠি। অনন্ত সময়কে কি পরিমাপ করা সম্ভব? কখনোই না। মানুষের কাছে সময় সবসময় অসীম। আর অনন্ত কালের হিসেব করতে গেলে এত ক্ষণস্থায়ী কিছুকে পরিমাপের একক বানানো সম্ভব নয়।

“অনেক সময় অবশ্য একটি অসম্ভব পরিমাপকে অন্য মাত্রায় চিন্তা করলে নিশ্চয়তার সাথে হিসেব করা সম্ভব হয়। এতে পরিমাপ সরল হয়ে ওঠে। এই কৌশলটাই গাণিতিক বিজ্ঞানের প্রধান উদ্দেশ্য।“

“এই উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্যে গণিতবিদকে সংখ্যা নিয়ে পড়াশোনা করতে হয়। তাদের বৈশিষ্ট্য ও বিন্যাস জানতে হয়। এর নাম পাটিগণিত। এটা জানা হয়ে গেলে সংখ্যাকে বিভিন্ন মাত্রার পরিমাণ নির্ণোয়ের জন্যে কাজে লাগানো যায়। প্রতীক ও সমীকরণের মাধ্যমে প্রকাশিত অজানা রাশির মান বের করা যায়। এভাবে আমরা পাই বীজগণিত। বাস্তবে আমরা যেসব জিনিস পরিমাপ করি তা জড় বস্তু বা প্রতীকের মাধ্যমে প্রকাশ করি। দুই ক্ষেত্রেই এই বস্তু বা প্রতীকগুলোর তিনটি বৈশিষ্ট্য থাকে: আকৃতি, আকার ও অবস্থান। এজন্যে এই বৈশিষ্ট্যগুলো জানা গুরুত্বপূর্ণ। এটাই জ্যামিতির কাজ।

“গতি ও বলকে নিয়ন্ত্রণকারী সূত্র নিয়েও গণিত কাজ করে। যেসব সূত্রের দেখা আমরা গতিবিদ্যায় (mechanics)। মানুষ তার সব বিস্ময়কর প্রতিভা আরও একটি বিজ্ঞানের পেছনে কাজে লাগিয়েছে। যেটি মানুষের চেতনার উৎকর্ষ ঘটায়। অবস্থানকে উন্নত করে। সেই বিজ্ঞানের নাম জ্যোতির্বিজ্ঞান।

“কেউ কেউ মনে করেন, গণিতের মধ্যে পাটিগণিত, বীজগণিত আর জ্যামিতি একদম স্বতন্ত্র বিষয়। এটা বড় একটি ভুল ধারণা। সবগুলো শাখাই একাত্ম হয়ে কাজ করে। একে অন্যকে সহায়তা করে। কখনও কখনও তো একটির জায়গায় অন্যটি দিয়েই কাজ চালানো যায়।

“গণিত মানুষকে সরল ও বিনয়ী হতে শিক্ষা দেয়। সব কলা ও বিজ্ঞানের ভিত্তি গণিত।

“তোমাকে আমি এক ইয়েমেনি রাজার একটি ঘটনা বলছি। ইয়েমেনের রাজা আসাদ আবু কারিব একদিন তার রাজপ্রাসাদের বিশাল বারান্দায় বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। তিনি স্বপ্ন দেখলেন, সাতজন বালিকা রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। মরুভূমির প্রখর রোদে ক্লান্ত ও তৃষ্ণার্ত হয়ে তারা থেমে দাঁড়াল। ঠিক তখনই সেখানে একজন রাজকুমারীকে দেখা গেল। তিনি একটি কলসি থেকে তাদেরকে পানি খেতে দিলেন। রাজকুমারী তাদের পিপাসা মিটিয়ে দিলে তারা আবার নতুন উদ্যমে পথ চলতে লাগল।

দূর্বোধ্য এই স্বপ্ন দেখে রাজা আবু কারিব অত্যন্ত মুগ্ধ হলেন। সানিব নামে একজন স্বপ্নের ব্যাখ্যাতাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। সানিব বললেন, ‘হুজুর, পথে হেঁটে যাওয়া সাতজন বালিকা হলো স্বর্গীয় সাত শিল্পকলা ও মানব বিজ্ঞান: চিত্রশিল্প, সঙ্গীত, নির্মাণশিল্প, স্থাপত্যকৌশল, অলঙ্কারশাস্ত্র, ন্যায়শাস্ত্র ও দর্শন। তাদেরকে সহায়তা করা দয়ালু রাজকুমারী হলেন মহান গাণিতিক বিজ্ঞান।‘

‘গণিতের সাহায্য ছাড়া,’ জ্ঞানী লোকটি আরও বললেন, ‘শিল্পকলার উন্নতি হবে না। বিজ্ঞান ধ্বংস হয়ে যাবে।‘

এসব কথায় প্রভাবিত হয়ে রাজা সবগুলো শহর, গ্রাম ও মরুদ্যানে গণিত শিক্ষাদান কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত নেন। রাজ আদেশ পেয়ে দক্ষ ও বাগ্মী পণ্ডিতরা বাজার, মুসাফিরখানা ও কাফেলায় ঘুরে ঘুরে ব্যবসায়ী ও যাযাবরদের পাটিগণিত শিক্ষা দিতে লাগল। কয়েক মাসের মধ্যেই দেশ আগের চেয়ে উন্নত হলো। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে দেশের সত্যিকার সম্পদও সমৃদ্ধ হচ্ছিল। বিদ্যালয়গুলো শিক্ষার্থী দিয়ে ভরপুর হচ্ছিল। বাণিজ্যের দ্রুত বিস্তার ঘটল। শৈল্পিক কাজের পরিধি বাড়ল। স্থাপনা তৈরি হলো। দুর্লভ ও বিদেশী সম্পদে শহরগুলো ভরে উঠল। ইয়েমেন দেশের উন্নতি ও প্রাচুর্যের দরজা উন্মক্ত হয়ে গেল। কিন্তু হঠাৎ বিপদ এল। কাজ ও সম্পদের মহান অগ্রগতি থেমে গেল। আত্মায়ী আসরাইলের হাতে খুন হয়ে রাজা আবু কারিব এ পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করলেন।

রাজার মৃত্যুতে দুটি কবর তৈরি হলো। একটিতে শায়িত হলেন মহিমান্বিত রাজা নিজে। আরেকটি সমাধিস্থ হলো মানুষের শৈল্পিক ও বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতি। অলস, অপদার্থ ও তুচ্ছ বুদ্ধিমত্তার অধিকারী এক রাজকুমার সিংহাসনে বসল। প্রশাসনিক সমস্যা সমধান না করে অনর্থক কাজের পেছনে সে সময় নষ্ট করতে থাকল কয়েক মাসের মধ্যে সকল রাজসিক কাজ বিশৃঙ্খল হয়ে উঠল। বিদ্যালয়গুলো বন্ধ হলো। দুষ্ট লোক ও চোরের ভয়ে জ্ঞানী ও শিল্পীরা দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হলো। অনর্থক উৎসব ও বিলাসবহুল ভোজের পেছনে রাজ কোষাগার ব্যবহার হতে লাগল। অব্যবস্থাপনার ফলে দেশ ধ্বংসের কিনারে চলে গেল। শেষ পর্যন্ত উৎসাহী শত্রুরা হানা দিল। দখল করে নিল ইয়েমেন।

“আসাদ আবু কারিবের গল্প থেকে দেখা যায়, একটি জাতির উন্নতি তাদের গাণিতিক দক্ষতার সাথে সম্পর্কিত। পুরো মহাবিশ্বে গণিত হলো সংখ্যা ও পরিমাপ। স্রষ্টার প্রতীক একত্ববাদ হলো সবকিছুর সূচনা, সংখ্যার অনুপাত ও সম্পর্কের অপরিবর্তিত বৈশিষ্ট্য ছাড়া যা অসম্ভব। মানব জীবনের সব ধাঁধাঁকে জানা বা অজানা চলক বা ধ্রুবক দিয়ে প্রকাশ করা যায়। যে রাশিগুলো দিয়ে সমাধান করা যায় ধাঁধাঁগুলো।

“অতএব এই বিজ্ঞানটাকে বুঝতে হলে আমাদেরকে সংখ্যা দিয়ে শুরু করতে হবে। দয়াময় আল্লাহর সাহায্যে আমরা সেটা দেখব ভবিষ্যতে। সালাম।“

এই বলে গণনাকারী প্রথম ক্লাস শেষ করলেন। এরপর আমরা মখমলের পর্দার ওপাশ থেকে হৃদয়গ্রাহী চমক হিসেবে অদৃশ্য শিক্ষার্থীর কণ্ঠ শুনতে পেলাম। সে বলল:

“হে আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা, সর্বশক্তিমান আল্লাহ, আমাদের অন্তরের দারিদ্র্য, নীচতা ও অপরিপক্বতা ক্ষমা করুন। আমাদের কণ্ঠ নয়, শুনুন আমাদের অব্যক্ত কাকুতি। আমাদের কামনা নয়, শুনুন আমাদের প্রয়োজনের ভাষাগুলো। আমরা এমন কতই না জিনিস চাই, যেগুলো কখনোই আমাদের হবে না।“

“আল্লাহ মহান!

“হে আল্লাহ! আমরা আমাদের মহান আবাস এই পৃথিবী, এর আকার ও প্রাচুর্যের জন্যে কৃতজ্ঞ। যে পৃথিবীর জীববৈচিত্র্যের অংশ আমরা। নীল আকাশের মহিমা, সন্ধ্যার সুশীতল বাতাস, নদীতে বয়ে চলা পান্‌ দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকা পাহাড়, ফলবান গাছ ও পায়ের জন্যে আরামদায়ক ঘাসের গালিচার জন্যে তোমারই প্রশংসা।

“আল্লাহ করুণাময়!

“জীবন ও ভালবাসার সৌন্দর্যের চেতনা অনুভব করায় যে আনন্দগুলো তার জন্যেও তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

“হে করুণাময় আল্লাহ, আমাদের অন্তরের দারিদ্র্য, নীচতা ও অপরিপক্বতা ক্ষমা করুন।“

১২

বৃত্তাকার যুক্তি

বেরেমিজের লাফানোর দড়ির প্রতি ভালবাসা। *মারাজান* ও মাকড়সার চলা পথের বক্রতা। পিথাগোরাস ও বৃত্ত। হারিম নামিরের সাথে দেখা। ষাট তরুমুজের সমস্যা। কাজী যেভাবে বাজিতে হারলেন। সূর্যোদয়ের সময় অন্ধ মুয়াজ্জিনের নামাজের দিকে আহ্বান।

ইয়াজিদের সুন্দর প্রাসাদ ছেড়ে আসার সময় নামাজের সময় হয়ে গিয়েছিল। রামিহের মাজার পার হচ্ছি। একটি পুরনো ডুমুর গাছের ডালে বসে পাখিরা ডাকছে। “দেখুন! এগুলো নিশ্চয় আজ মুক্ত হওয়া পাখি।“ বললাম। তবে বেরেমিজ তখন পাখির গানের দিকে আগ্রহী ছিলেন না। কাছের সড়কে শিশুরা খেলছে। সে মন দিয়ে তাই দেখছে। শিশুদের দুজন চার কি পাঁচ হাত লম্বা একটি সরু দড়ির দুই মাথা ধরে রেখেছে। বাকিরা দড়িটার ওপর দিয়ে লাফ দেওয়ার চেষ্টা করছে। দড়ি ধরে রাখা শিশু দুজন জাম্পারদে দক্ষতা দেখে দড়ির উচ্চতা বাড়াচ্ছে-কমাচ্ছে।

“দড়িটা দেখো, হে বাগদাদের বন্ধু।“ আমার বাহুতে হাত রেখে গণনাকারী বললেন। “এর বক্রতা কত নিখুঁত দেখো। তোমার কি মনে হয় এটাকে পর্যালোচনা করা দরকার?”

“কী বলছ তুমি? দড়ি?” আমি অবাক। “ছেলেদের শেষ আলোটুকুতে খেলাধুলার মধ্যে বিশেষ কিছু দেখছি না আমি।“

“বন্ধু, তুমি তাহলে প্রকৃতির সৌন্দর্য ও বিস্ময়ের প্রতি অন্ধ। শিশুরা দড়ির দুই মাথা ধরে উঁচু করে আবার দড়িকে নিজের ওজনের কারণে পড়ে যেতে দিলে দড়ি প্রাকৃতিক বলের প্রভাবে একটি কার্ভ (বক্রতা) তৈরি করে। অন্য সময়ও আমি এই কার্ভটি দেখেছি। পণ্ডিত নো-ইলিম এই কার্ভকে বলতেন *মারাজান*। কাপড়ের নকশা ও উটের কুঁজে এটা দেখা যায়। কার্ভটি কি দেখতে পরাবৃত্তের (parabola) মতো? আল্লাহ চাহে তো ভবিষ্যতের জ্যামিতিবিদরা এই কার্ভের প্রতিটি বিন্দু ধরে ধরে রেখা বরাবর চলার পথ বের করবেন। এর খুঁটিনাটি বৈশিষ্ট্য বের করবেন।“

“তবে,” বেরেমিজ বলে গেলেন, “এটা ছাড়াও আরও অনেক ও আরও গুরুত্বপূর্ণ কার্ভ আছে। প্রথমেই আসবে বৃত্তের কথা। গ্রিক দার্শনিক ও গণিতবিদ পিথাগোরাস বৃত্তকে সবচেয়ে পারফেক্ট কার্ভ মনে করতেন। তিনি বৃত্তকে পারফেকশনের প্রতীকই মনে করতেন। আর বৃত্ত শুধু সবচেয়ে পারফেক্ট কার্ভই নয়। সবচেয়ে সহজে আঁকার মতো কার্ভও এটি।“

এ বলে বেরেমিজ কার্ভ নিয়ে দেওয়া বক্তব্য থামালেন। একটু দূরের একজন যুবকের তিকে হাত দেখিয়ে জোরে বলে উঠলেন, “হারিম নামির!”

যুবক লোকটি চকিতে ঘুরে দাঁড়াল। হেসে পা বাড়াল আমাদের দিকে। দেখে চিনলাম। মরুভূমির সেই তিন ভাইয়ের একজন, যারা ৩৫টি উট নিয়ে তর্ক করছিল। এক তৃতীয়াংশ ও এক নবমাংশ উটের সেই সমস্যা বেরেমিজ চমৎকার কৌশলে সমাধান করেন। আগেই সেটা বিস্তারিত বলেছি।

“নিয়তি আমাদেরকে মহান গণনাকারীর কাছে নিয়ে এসেছে। আমার ভাই হামিদ ৬০টি তরমুজের সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করছেন। কেউ সমাধান দিতে পারছে না।“

হারিম আমাদেরকে একটি বাড়িতে নিয়ে এল। সেখানে তার ভাই হামিদ নামির ও কয়েকজন বণিককে দেখা গেল।

বেরেমিজকে দেখে হামিদ অত্যন্ত খুশি হলেন। বণিকদের দিকে ঘুরে বললেন, “ইনি একজন অসাধারণ গণিতবিদ। তাঁর সহায়তায় আমরা সমধানের প্রায় অযোগ্য একটি সমস্যার সমাধান পাই। তিনি ৩৫টি উট তিন লোকের মধ্যে সুন্দরভাবে ভাগ করে দেন। আমি নিশ্চিত, আমাদের ৬০ তরমুজের সমস্যা তিনি নিমিষেই সমাধান করে ফেলবেন।“

বেরেমিজকে সমস্যাটি জানানো হলো। একজন বণিক ব্যাখ্যা করলেন, “দুই ভাই হারিম ও হামিদ আমাকে দুই বস্তা তরমুজ দিয়েছিল বাজারে বিক্রি করে দেওয়ার জন্যে। হারিম দেয় ৩০টি তরমুজ, যেগুলোর প্রতি ৩টিকে ১ দিনারে বিক্রি করার কথা। হামিদও ৩০টি তরমুজ দিয়েছে। তবে এগুলোর দাম বেশি। ২টি করে তরমুজের দাম ১ দিনার। বিক্রির পরে তাহলে হারিম ১০ দিনার ও হামিদ ১৫ দিনার পাওয়ার কথা। মোট বিক্রয়মূল্য হওয়ার কথা ২৫।

“কিন্তু বাজারে যাওয়ার পর একটি সমস্যা লক্ষ্য করলাম। দামী তরমুজগুলো আগে বিক্রয় করলে ক্রেতারা আকৃষ্ট হবে না। আবার, আগে স্বস্তা তরমুজ বিক্রয় করলে পরে দামী তরমুজ বিক্রি করতে অসুবিধা হবে। সমাধান হলো দুই ধরনের তরমুজ একইসাথে বিক্রি করা।

“যেমন ভাবা তেমন কাজ। দুই বস্তার তরমুজ মিশিয়ে ৫টি করে তরমুজের লট বানালাম। এক বস্তার ২টি ও আরেক বস্তার ৩টি। প্রতিটি লটের দাম ২ দিনার। ভাবলাম, ৩টির দাম ১ দিনার ও ২টির দাম ১ দিনার হলে তো ৫টি তরমুজের দাম ২ দিনার হওয়া উচিত।

“এভাবে ৬০টি তরমুজ থেকে ১২টি লট হলো। মোট পেলাম ২৪ দিনার। কিন্তু দুই ভাইকে তো ১০ ও ১৫ মিলিয়ে ২৫ দিনার দিতে হয়। এক দিনার কম। আমি পার্থক্যের হিসাব খুঁজে পাচ্ছি না। আমি খুব যত্নের সাথে ব্যবসা করেছি। ৩টি তরমুজ ১ দিনার আর ২টি তরমুজ ১ দিনার হলে ৫টি তরমুজের দাম ২ দিনার হবে না?”

“ব্যাপারটাতে কোনো ঝামেলাই হত না, “ বলল হামিদ নামির, “যদি না কাজী নাক না গলাতেন। তিনি বাজারও দেখাশোনা করেন। এটা শুনে তিনি বললেন, তিনি জানেন না কীভাবে এই পার্থক্যের উদয় হলো। তিনি মনে করছেন, বিক্রির সময় হয়ত একটি তরমুজ চুরি হয়ে গেছে।“

“তরমুজ চুরি হয়নি।“ বেরেমিজ বললেন। “আমি ব্যাখ্যা করছি।“

“হারিমের বস্তায় ছিল ৩০টি তরমুজ। ১ দিনারের প্রতি লটে ৩ তরমুজ। মোট হবে ১০ দিনার।

“হামিদের বস্তায় ছিল ৩০টি তরমুজ। ১ দিনারের প্রতি লটে ২ তরমুজ। মোট হবে ১৫ দিনার। খেয়াল করুন, দুই বস্তায় লটের সংখ্যা সমান নয়। হারিমের লট ১০টি। হামিদের ১৫টি। ৫টি করে লট বানিয়ে বিক্রি করতে চাইলে শুধু ১০টি লট ২ দিনার করে বিক্রি করা যাবে। এই ১০ লট বিক্রি করা শেষ হলেও হামিদের ১০টি তরমুজ বাকি থাকবে। এগুলোর দাম কিন্তু বেশি। এগুলোকে ১ দিনারে ২টি করে বিক্রি করতে হবে।



চিত্র: ৬০ তরমুজের ব্যাখ্যা সহজেই বোঝা যায় চিত্র থেকে: **ক** অংশে ৩০টি তরমুজ আছে, যেগুলোকে ১ দিনারে ৩টি করে বিক্রি করতে হবে; **খ** অংশেও ৩০টি তরমুজ আছে, যেগুলোকে প্রতি দিনারে ২টি করে বিক্রি করতে হবে। দুই অংশকে একসাথে বিবেচনা করলে দেখা যায়, দুই বস্তা থেকেই তরমুজ নিয়ে ১০টি লট হয়। খ ধরনের ১০টি তরমুজ তবুও বাকি থাকে। এই ১০টিকে ১ দিনারে ২টি করে বিক্রি করা প্রয়োজন ছিল। তাহলে ২৫ দিনার হত।

“এক দিনারের পার্থক্য এসেছে শেষ এই ১০টি তরমুজ থেকে। কোনো চুরির ঘটনা ঘটেনি। দুই বস্তার তরমুজের দামের পার্থক্য থেকে ১ টাকার ক্ষতি হয়েছে।

এ সময় আলোচনা শেষ করতে হলো। ইথারে ভেসে এল মুয়াজ্জিনের কণ্ঠ। বিশ্বাসীদেরকে বিকেলের নামাজের জন্যে ডাকছেন।

“হাইয়া আলাস সালাহ! হাইয়া আলাস সালাহ!”

পবিত্র গ্রন্থের নির্দেশ মোতাবেক আর দেরি না করে আমরা নামাজের জন্যে প্রস্তুত হলাম। সূর্য দিগন্ত পার হয়ে গেছে। সন্ধ্যার গোধূলির সময়ের নামাজ মাগরিবের সময় হয়েছে। মসজিদুল ওমর (রাঃ) থেকে অন্ধ মুয়াজ্জিন বিশ্বাসীদের উদ্দেশ্য গভীর ও ধীরলয়ে ডেকে যাচ্ছেন:

“আল্লাহ মহান। মুহাম্মাদ সাঃ আল্লাহর রাসুল। সালাতের দিকে আসুন।“

বণিকরা ব্যাগপত্র গুছিয়ে বেরেমিজের পিছু পিছু পবিত্র নগরীর দিকে ছুটল। মুখে আওড়াতে লাগল:

“হে আল্লাহ, হে মহাজ্ঞানী ও পরম দয়ালু, পৃথিবী ও আকাশের সর্বশক্তিমান স্রষ্টার জন্যে সমস্তা প্রশংসা, আমাদেরকে সত্য ও সঠিক পথে পরিচালিত করুন। তাদের পথে যাদেরকে আপনি সুরক্ষা দিয়েছেন ও আশীর্বাদ দান করেছেন।“

১৩

বন্ধুত্ব সীমাহীন

খলিফা প্রাসাদে আমাদের গমন। তাঁর অনুগ্রহে আমরা দরবারে উপস্থিত হলাম। কবি ও বন্ধুত্বের গল্প। মানুষ ও সংখ্যার মধ্যে বন্ধুত্ব। গণনাকারী বাগদাদের খলিফার প্রশংসা অর্জন করলেন।

চারদিন পরের সকাল। জানলাম, আমিরুল মোমেনি খলিফা আবুল আব্বাস আল-মুতাসিম বিল্লাহর দরবারে আমাদেরকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এমন সংবাদ যেকোনো মুসলমানের জন্যেই আনন্দের। আমি ও বেরেমিজ দুজনই এমন আমন্ত্রণ প্রত্যাশা করছিলাম।

খলিফা হয়ত ইয়াজিদের কাছে গণিতবিদের কৃতিত্বের কথা শুনে তাঁকে কাছ থেকে জানার ব্যাপারে আগ্রহী হয়েছেন। বাগদাদের বিখ্যাত মানুষদের ভীড়ে দরবারে আমাদের উপস্থিতির আর কোনো ব্যাখ্যা হয় না।

জাঁকজমকপূর্ণ প্রাসাদে প্রবেশ করে আমার চোখ ধাঁধিঁয়ে গেল। প্রবেশপথ চমৎকারভাবে সাজানো ধনুকাকৃতি খিলানে ঢাকা। দুই পাশে লম্বা ও সরু পিলার খিলানকে ধরে রেখেছে। খিলানগুলোর ভিত্তি চমৎকার মোজাইক দিয়ে সজ্জিত। খেয়াল করলাম, মোজাইকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লাল ও সাদা টালির প্রলেপ দিয়ে তৈরি। প্রধান কক্ষের ছাদ নীল ও সোনালী রং করা। কক্ষগুলোর দেয়ালের টাইলসে বিভিন্ন অলঙ্করণ শোভা পাচ্ছে। মেঝেটা মোজাইক নির্মিত। জাফরি, গালিচা, ডিভান—সত্যি বলতে সব সাজসজ্জা রূপকথার এক হিন্দু রাজকুমারের প্রাসাদের মতো জাঁকজমকপূর্ণ।

ঘরের বাইরের বাগানগুলো একইরকম চাকচিক্যময়। সাথে যোগ হয়েছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। বাতাসে হাজার রকমের ঘ্রাণ। যেন সবুজ গালিছা বিছানো। নদীর পানি বাগানকে ভিজিয়ে দেয় ক্ষণে। সতেজ করে দেয় শ্বেত মর্মর (মার্বেল) পাথরের অসংখ্য ঝর্ণা, যেগুলোর আশেপাশে কাজ করছে হাজার হাজার শ্রমিক।

আমরা প্রাসাদে পৌঁছলে উজির ইব্রাহিম মালুফের একজন সহকারী বসার ডিভান দেখিয়ে দিল। দেখলাম শক্তিধর বাদশাহ হাঁতির দাঁত ও মখমলের বিলাসবহুল সিংহাসনে বসে আছেন। বিশাল কক্ষের অভিনব সৌন্দর্য আমাকে কিছুটা বিচলিত করল। সবগুলো দেয়ালে সুদক্ষ ক্যালিগ্রাফার দ্বারা খোদাই করা সুন্দর সুন্দর লেখা। খেয়াল করে দেখলাম, লেখাগুলো আমাদের ভাল ভাল কবিদের কবিতার চরণ। কুশনসহ প্রায় সর্বত্র রয়েছে ফুলের ঝুড়ি। পাপড়িবিহীন ফুল, গালিচায় কাপড় দিয়ে বোনা ফুল, সোনালী রংয়ের পাত্রে সূক্ষ্মভাবে ফুটিয়ে তোলা ফুল।

জমকালো পিলারগুলোও আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। মুর শিল্পীদের বাটালি পিলারের ক্যাপ ও শ্যাফটগুলোকে কারুকার্যময় করে তুলেছে। ফুল ও পাতার নকশার জ্যামিতিক বৈচিত্র্য অতুলনীয়। বহু রকমের উদ্ভিদ খুব চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। সৌন্দর্য বলে বোঝানো যাবে না।

দরবারে উপস্থিত সাতজন উজির, দুজন বিচারক, কয়েকজন পণ্ডিত ও পরিচিত কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তি।

মহান মালুফ আমাদের পরিচয় তুলে ধরলেন। কনুই কোমর বরাবর রেখে হাত প্রসারিত করে বললেন, “হে মহামান্য খলিফা, আপনার নির্দেশ অনুসারে এই মহান দরবারে আমার সচিব বেরেমিজ সামির ও তাঁর বন্ধু দরবারের নথিলেখক হানাক তাদে মাইয়াকে নিয়ে এসেছি। তারা তাদের সম্পর্কে বলেবন।“

“আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি, হে মুসলিম ভাইয়েরা!” সুলতান উষ্ণ ও বন্ধুভাবাপন্ন সুরে বললেন। “আমি জ্ঞানী লোকদের সম্মান করি। “এই দেশের আকাশের নীচের কোনো পাকা গণিতবিদ আমার সহায়তা ও যত্নশীল তত্ত্বাবধানের প্রতি আস্থা রাখতে পারে।“

“হে মনিব, আল্লাহ আপনাকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন।“ বেরেমিজ বলল বিনয়ের সাথে।

আমি দুই হাত আড়াআড়ি রেখে শ্রদ্ধার সাথে চুপ করে থাকলাম। আমাকে কিছু বলতে বলা হয়নি দেখে মুখ খুললাম না।

আরবদের শাসনকর্তাকে অকপট ও উদার মনের অধিকারী বলে মনে হলো। তাঁর মুখমণ্ডল উজ্জ্বল। মরু রোদে পুড়ে তামাটে হয়েছে। বয়সের তুলনায় বেশি ভাঁজ পড়েছে। একটু পরপরই হাসেন তিনি। হাসার সময় সাদা দাঁত বের হয়ে পড়ে। রেশমের কোমরবন্ধে একটি রুচিশীল খঞ্জর বাঁধা। খঞ্জরের খাপ মূল্যবান পাথরখচিত। মাথায় নীল পাগড়ি। তাতে সাদা ডোরাকাটা দাগ। সবাই জানেন, সবুজ হলো হযরত মুহাম্মাদের (সাঃ) উত্তরসূরীরা সবুজকে একটি চিহ্ন হিসেবে ব্যবহার করেন।

“অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করতে হবে।“ খলিফা বললেন। “তবে আগেই কোনো বড় রাজনৈতিক আলোচনায় যেতে চাই না। আমার বন্ধু ইয়াজিদ পারস্যের এই গণিতবিদের উচ্চ প্রশংসা করেছেন। আমি আগে দেখতে চাই, উনি আসলেই যোগ্য ও দক্ষ গণিতজ্ঞ কিনা।“

মহান শাসকের ইঙ্গিত পেয়ে বেরেমিজ নিজের প্রতি শেখ ইয়াজিদের আস্থা প্রমাণ করার প্রয়োজন অনুভব করলেন। সুলতানকে উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন, “হে আমিরুল মোমেনিন, আমি আপনার অনুগ্রহপ্রাপ্ত একজন সাধারণ রাখাল ছাড়া আর কিছু নই।“

একটু বিরতি নিয়ে বললেন, “তবুও আমার সহৃদয় বন্ধুরা আমাকে গণিতবিদ বলাকে যুক্তিসঙ্গত মনে করে। এমন উচ্চপ্রশংসা আমাকে আনন্দই দেয়। তবে আমি মনে করি, সব মানুষই ভাল হিসাব করতে পারে। একজন সৈনিক সামনে এক নজর তাকিয়েই দূরত্ব মেপে নেন। একজন কবিও গণনায় দক্ষ। তিনি কবিতার অক্ষর ও ছন্দের হিসাব রাখেন। সুরকার তার গানে নিখুঁত ঐকতান প্রয়োগ করেন। চিত্রশীল্পী মনের মধ্যে সুষম অনুপাত তৈরি করেন। একজন ছোট গালিচা প্রস্তুতকারীও পরিশ্রম করে একটি একটি করে সুতায় জোড়া দেন। সুলতান, এদের সবাই দক্ষ ও ভাল গণনাকারী।“

বেরেমিজ সিংহাসনের আশেপাশে বসা সবার দিকে এক নজর তাকিয়ে বললেন, “আমি দেখে অত্যন্ত খুশি হয়েছি যে আপনার চারপাশে জ্ঞানী ও বিজ্ঞ লোকরা আছেন। আপনার সিংহাসনের চারপাশে আছেন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, যারা পড়াশোনায় মগ্ন থাকেন। বিজ্ঞানের সীমানাকে যারা লম্বা করতে থাকেন। হে সুলতান, আমি মনে করি, বিজ্ঞ লোকদের সংস্পর্শ সবচেয়ে বড় ধন। একজন মানুষের জ্ঞানই তার যোগ্যতা পরিমাপক। জ্ঞানীরা উদাহরণের মাধ্যমে শিক্ষা দান করেন। মানুষকে বোঝানোর জন্যে উদাহরণের চেয়ে বেশি বিশ্বাসযোগ্য কোনো উপায় নেই। তবে জ্ঞান অর্জনের একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত কল্যাণ সাধন।

গ্রিক দার্শনিক সক্রেটিস তাঁর সব জ্ঞানের গুরুত্ব এ দিকটিতেই দিয়েছেন। বলেছেন, ‘একমাত্র সার্থক জ্ঞান তাই যা আমাদেরকে আগের চেয়ে ভাল করে।‘ আরেক বিখ্যাত চিন্তাবিদ সেনেকা বলেছেন, ‘সরলরেখা চিনে কী লাভ যদি একজন মানুষ সৎ-ই না হয়?’ হে মহান ও উদার শাসক, আমি এই কক্ষে উপস্থিত সকল জ্ঞানী ও বিজ্ঞ লোকদের প্রতি শ্রদ্ধা পেশ করছি।“

গণনাকারী একটু বিরতি নিলেন। এরপর কণ্ঠে ভাবগাম্ভীর্য ও শ্রুতিমধুরতা বজায় রেখে বললেন, “আল্লাহ যেসব জিনিসকে জড় থেকে জীবে পরিণত করেন আমার নিত্যদিনের কাজের ফাঁকে আমি সেসব খেয়াল করেছি। এসব দেখে আমি সংখ্যাকে গুরুত্ব দিতে শিখেছি। সংখ্যাকে প্রায়োগিক ও নির্ভরযোগ্য সূত্রের মাধ্যমে ব্যবহার করতে শিখেছি।

“তবে একটু আগে আপনি যে প্রমাণের কথা বলেছেন তা পেশ করতে একটু অসুবিধাবোধ করছি। তবে আপনার অনন্য উদারতার প্রতি সম্মান রেখে বলতে হয়, এই অভিনব ডিভানে গণিতের প্রশংসনীয় ও সুবচন ছাড়া কিছু দেখছি না। এই অভিজাত রুমের দেয়ালগুলো বিভিন্ন কবিতা দিয়ে সাজানো। প্রতিটিতে শব্দ আছে ৫০৪টি। কিছু অক্ষরের রং কালো। বাকি অক্ষরগুলো লাল রংয়ের। যে ক্যালিগ্রাফার ৫০৪ শব্দের বিভিন্ন কবিতার শব্দগুলো এখানে বসিয়েছেন তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন, যেসব কবিদের অমর কথামালা এখানে আছে, মেধা ও কল্পনাশক্তিতে তিনি তাদের চেয়ে পিছিয়ে নন।

“আসলে,” বেরেমিজ বলে গেলেন, “কারণটা সহজ। অপূর্ব সুন্দর এই কক্ষের সৌন্দর্য বৃদ্ধিকারী এই অতুলনীয় পঙতিগুলোতে বন্ধুত্বের প্রশংসা দেখতে পাচ্ছি। ওখানে পিলারের কাছে কবি আল-মুহালহিলের বিখ্যাত কবিতাটির প্রথম লাইন দেখতে পাচ্ছি:

আমার বন্ধুরা আমাকে ছেড়ে গেলে আমি হব সবচেয়ে হতভাগা,

কারণ আমি হব সম্পদহারা

আর ওখানে তারাফার একটি লাইন দেখতে পাচ্ছি:

জীবনের মোহনীয়তা আমাদের তৈরি মহান বন্ধুত্বের মধ্যেই শুধু নিহিত

আসলে এর সবগুলোই মহিমান্বিত, জ্ঞানগর্ভ ও উত্তম কথা। তবে আসল সৌন্দর্য হলো ক্যালিগ্রাফারের সৃজনশীলতাটি। তিনি দেখিয়েছেন, এই পঙতিগুলো যে বন্ধুত্বের কথা বলে সেটি যে শুধু প্রাণ ও অনুভবধারীদের মধ্যেই আছে তা নয়। বন্ধুত্ব আছে সংখ্যাদের মাঝেও।

“আপনি নিশ্চয়ই জানতে চাইবেন, গাণিতিক বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ সংখ্যা কীভাবে খুঁজে পাব? সংখ্যার আবদ্ধ ধারা থেকে জ্যামিতি কীভাবে সেসব সংখ্যাকে খুঁজে পাবে?

“আমি যতটা সংক্ষেপে পারি সংখ্যার বন্ধুত্ব ব্যাখ্যা করব। ২২০ ও ২৮৪ সংখ্যা দুটির কথাই ভাবুন। ২২০ যেসব সংখ্যা দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য সেগুলো হলো:

১, ২, ৪, ৫, ১০, ১১, ২০, ২২, ৪৪, ৫৫ ও ১১০

আবার ২৮৪ যেসব সংখ্যা দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য সেগুলো হলো:

১, ২, ৪, ৭১ ও ১৪২

“এই দুটি সংখ্যার মধ্যে লক্ষ্যণীয় রকমের মিল আছে। ২২০-এর উৎপাদকগুলো যোগ করলে আমরা পাই ২৮৪। আবার ২৮৪-এর উৎপাদকগুলো যোগ করলে পাই ২২০।

“এই ফলাফল থেকে গণিতবিদরা ঠিক করেছেন ২২০ ও ২৮৪ সংখ্যা দুটি একে অপরের বন্ধু। দুটি সংখ্যাই একে অপরের হয়ে কাজ করে, আনন্দ ও সুরক্ষা এবং সম্মান করে।“

বেরেমিজ কথা শেষ করতে গিয়ে বললেন, “এখন খেয়াল করুন, হে মহান ও ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ, এখানে বন্ধুত্বের প্রশংসা নিয়ে লেখা কবিতাগুলোতে ৫০৪টি শব্দ আছে। এগুলো কীভাবে লেখা হয়েছে দেখুন। ২২০টি শব্দ কালো অক্ষরে ও ২৮৪টি শব্দ লাল অক্ষরে। আমি ব্যাখ্যা করেছি, সংখ্যা দুটো একে অপরের বন্ধু।

“এবার আরেকটি মজার সম্পর্ক দেখুন। ৫০৪টি শব্দকে ৩২ লাইনে লেখা হয়েছে। এখন দেখুন ২৮৪ ও ২২০-এর পার্থক্য ৬৪। এ সংখ্যাটি একটি বর্গ সংখ্যা, ঘন সংখ্যা এবং লাইনের সংখ্যার দ্বিগুণ।

“একজন সন্দেহবাদী হয়ত বলবে এসবকিছু ঘটনাক্রমে ঘটে গেছে। কিন্তু মহানবী মুহাম্মাদের (সাঃ) অনুসারী প্রার্থনা ও শান্তিতে বিশ্বাসী একজন মুমিন জানে, ঘটনাক্রমে এমন ঘটনা ঘটে না। আল্লাহ এগুলো ভাগ্যলিপিতে লিখে রেখেছেন। আমি ঘোষণা করছি, সেই ক্যালিগ্রাফার ৫০৪কে ২২০ ও ২৮৪ সংখ্যা দুটিতে বিভক্ত করে এমন একটি কবিতা লিখেছেন যা প্রত্যেকটি মানুষকে মুগ্ধ করবে।“

গণনাকারীর কথা শুনে খলিফা অত্যন্ত খুশী হলেন। গণনাকারী এক নজর দেখেই ৩০টি কবিতার ৫০৪টি শব্দ গুণে ফেলেছে। প্রমাণ করে দেখিয়েছে ২২০টি কালো কালিতে ও ২৮৪টি লাল কালিতে লেখা।

“হে সংখ্যামানব, আপনার কথায় আমি নিশ্চিতভাবে বুঝতে পেরেছি, আপনি সত্যিই সর্বোচ্চ যোগ্যতার একজন গণিতবিদ। সংখ্যার এ অভিনব সম্পর্ক—যাকে আপনি বলছেন সংখ্যাগত বন্ধুত্ব—আমার অনেক ভাল লেগেছে। আমি এখন খুঁজে বের করতে ইচ্ছুক কোন ক্যালিগ্রাফার এই কক্ষের দেয়ালে পঙতিগুলো লিখেছেন। সহজেই জানা যাবে, তিনি কি ৫০৪টি শব্দকে ইচ্ছা করেই এভাবে ভাগ করেছেন, নাকি এটা ঘটনাচক্রে আল্লাহর ইচ্ছায় হয়ে গেছে।“

সুলতান আল-মুতাসিম একজন সচিবকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, “নুরুদ্দিন জরুর, তুমি কি জানো, এই প্রাসাদে কোন ক্যালিগ্রাফার কাজ করেছিলেন?”

“আমি তাকে খুব ভাল করে চিনি, হুজুর। সে উসমান মসজিদের কাছেই থাকে।“ উত্তর দিল সচিব।

“তাকে যত দ্রুত সম্ভব এখানে নিয়ে এসো।“ খলিফা আদেশ দিলেন। “আমি তার কাছে ব্যাপারটা জানতে চাইব।“

“ঠিক আছে, দেখছি।“

সচিব সুলতানের আদেশ নিয়ে তীরবেগে দরবার থেকে বেরিয়ে গেল।

১৪

এক চিরন্তন সত্য

দরবার কক্ষের ঘটনা। বেরেমিজ যেভাবে তাবেসা ও ইক্লিমিয়াকে আলাদা করে চিনলেন। একজন ঈর্ষাপরায়ণ মন্ত্রী বেরেমিজের সমালোচনা করলেন। গণনাকারী তাত্ত্বিক ও স্বপ্নবাজদের প্রশংসা করেন। সুলতান উপহারের বদলে তত্ত্বকে বিজয়ী ঘোষণা করলেন।

সুলতানের দূত নুরুদ্দিন জরুর ক্যালিগ্রাফারের সন্ধানে বের হয়ে গেলেন। যে ক্যালিগ্রাফার কবিতার পঙতি দিয়ে কক্ষ সাজিয়েছিলেন। এদিকে কক্ষে প্রবেশ করল পাঁচ মিশরীয় গায়ক। তাদের দরদ মাখা কণ্ঠে শোনা গেল আরবীয় গান ও সুর। গানের সাথে তারা বাজার হার্প, বহুতার (জিথার) ও বাঁশি। গানের তালে তালে নাচছিল দুজন নৃত্যশিল্পী। দেখে স্পেনীয় মনে হচ্ছে। জড় হওয়া মানুষের বিনোদনের জন্যে তারা বড়, বৃত্তাকার মঞ্চে নাচছিল।

নাচিয়ে মেয়েদেরকে সযত্নে বাছাই করা হয়। এক জোড়া নাচিয়ের শারীরিক মিলকে খুব কদর করা হয়। এমন এক জোড়া নাচিয়ে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়।

এই দুই কিশোরীর মিল সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল। দুজনই হালকা গড়নের। চেহারা কালো। চোখে কালো সুরমা দেওয়া। দুজনের গলায় একই রকম হার। কব্জিতে একই ব্রেসলেট। দুজনকে যাতে আলাদা করে চেনা না যায় সেজন্যে তাদেরকে জামাও পরানো হয়েছে একই ধরনের।

খলিফা অত্যন্ত রসিক মানুষই বটে! এক সময় তিনি বেরেমিজকে বললেন, “মেয়েদেরকে দেখেছেন? তারা অবিকল একই রকম। একজনের নাম ইক্লিমিয়া। আরেকজন তাবেসা। এরা খুব দামী দুই যমজ বোন। আমি কাউকেই পাইনি যে মঞ্চে এদেরকে আলাদা করে চিনতে পেরেছে। ভাল করে দেখুন। ইক্লিমিয়া এখন ডানে আছে। তাবেসা বাঁয়ে পিলারের পাশে।

“আমাকে স্বীকার করতে হবে, সুলতান“ বেরেমিজ বললেন, “এই নাচিয়ে দুজন চমৎকার। তবে তাদেরকে চেনা আমার কাছে খুবই সহজ মনে হচ্ছে। এর জন্যে শুধু তাদের পোশাক দেখাই যথেষ্ট।“

“তা কীভাবে সম্ভব?” সুলতান জিজ্ঞেস করলেন। “তাদের পোশাকে তো সামান্যতম পার্থক্যও নেই। আমার আদেশ মোতাবেক দুজনেই একই রকম পর্দা, ব্লাউজ ও ঘাগরা পরে।“

“আমাকে মাফ করবেন, হে মহান সুলতান।“ বেরেমিজ বিনয়ের সাথে বলল। দর্জি আপনার নির্দেশ যত্নের সাথে পালন করেনি। ইক্লিমিয়ার ঘাগরায় ঝালর আছে ৩১২টি। আর তাবেসার আছে ৩০৯টি। ঝালরের সংখ্যার পার্থক্যই তাদের সম্পর্কে দ্বিধা দূর করার জন্যে যথেষ্ট।

এটা শুনে সুলতান কয়েকবার হাত তালি দিলেন। নাচ বন্ধ করলেন। হাকিমকে মেয়েদের ঝালর একটি একটি করে গুণতে নির্দেশ দিলেন।

বেরেমিজে হিসাব প্রমাণিত হলো। ইক্লিমিয়ার ঝালর ৩১২ আর তার বোন তাবেসার ৩০৯।

“ইয়াল্লা!” খলিফা বলে উঠলেন, “কবি হলেও শেখ ইয়াজিদ তো একটুও বাড়িয়ে বলেনি। বেরেমিজ তো সত্যিই মেধাবী গণনামানব। তিনি দুইটি পোশাকেরই সবগুলো ঝালর গুণে ফেলেছেন। অথচ মেয়েরা মঞ্চের এ মাথা থেকে ও মাথা মোচড় দিয়ে দিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে। এ তো বিস্ময়কর এক মেধা!”

কিন্তু মানুষের মনে হিংসা প্রবেশ করে ফেললে সে অনেক জঘণ্য ও অভদ্র কাজ করতে পারে।

আল-মুতাসিমের দরবারে নাহুম ইবন নাহুম নামে একজন মন্ত্রী ছিল। সে ছিল খুব ঈর্ষাপরায়ণ ও খারাপ স্বভাবের মানুষ। খলিফার সামনে বেরেমিজের সম্মান তরতর করে বেড়ে যাচ্ছিল দেখে সে হতাশ হয়ে যাচ্ছিল। সে আমার বন্ধুকে বোকা বানানোর অপেচেষ্টা করল। সুলতানের কাছে এসে ধীরে ধীরে বলল:

“হে খলিফা, খেয়াল করলাম, আমাদের অতিথি এই পারসিক গণনাকারী বিভিন্ন বস্তু ও চিত্র খুব ভাল গুণতে পারেন। তিনি দেয়ালের ৫০০-এর মতো শব্দ গুণেছেন। সংখ্যার মধ্যের বন্ধুত্ব দেখিয়েছেন। তাদের পার্থক্য ৬৪-এর কথা বলেছেন। যা একইসাথে ঘন ও বর্গ সংখ্যা। শেষ পর্যন্ত তিনি মেয়েদের গাউনের ঝালরও একটি একটি করে গুণে ফেলছেন।

“প্রায়োগিক কাজ ভুলে আমাদের গণিতবিদরা এসব শিশুসুলভ কাজে সময় ব্যয় করলে ব্যাপারটা ভয়াবহ হবে। আচ্ছা, বলুন তো, আমাদের প্রিয় কবিতার লাইনগুলো ২২০ ও ২৮৪ শব্দে বিভক্ত জেনে কী লাভ? কবিতার লাইনের শব্দ গোণা বা লাল ও কালো কালির শব্দের সংখ্যা জানা কবিকে প্রশংসা করার কোনো উপায় হতে পারে না। নাচিয়ে মেয়েদের গাউনে ৩১২, ৩০৯ নাকি একেবারে ১,০০০টি ঝালর আছে তা বের করাও কোনো কাজের কাজ নয়। এগুলো হাস্যকত কাজ। সৌন্দর্য ও শিল্পের চর্চাবিদদের কাছে এগুলোর কোনো মূল্য নেই।

“বিজ্ঞ ব্যক্তিরা বিজ্ঞানের সহায়তায় জীবনের বড় বড় সমস্যাগুলো সমাধান সময় ব্যয় করেন। পণ্ডিতরা আল্লাহর দয়ায় গণিতের মতো বিজ্ঞানের বিশাল প্রাসাদ তৈরি করেছেন এই পারসিক গণনাকারীর মতো করে ব্যবহারের জন্যে নয়। আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্ত ইউক্লিড, আর্কিমিডিস ও মহান ওমর খৈয়ামদের বিজ্ঞানকে বিভিন্ন জিনিস গণনা করার কাজে লাগানোকে আমার কাছে অপরাধ বলে মনে হয়। আমি জানতে আগ্রহী এই গণনাকারীর যেসব মেধা আছে বলা হচ্ছে সেগুলো কাজে লাগিয়ে তিনি সত্যিকারের সমস্যা সমাধান করতে পারেন কি না। এমন সমস্যা যেগুলো দৈনন্দিন জীবনে কাজে আসে।“

“আমার বিশ্বাস আপনার একটু ভুল হয়েছে, মাননীয় মন্ত্রী।“ বেরেমিজ দ্রুতই জবাব দিলেন। “আপনার ভুল ধারণা দূর করা আমার জন্যে সম্মানের ব্যাপার হবে। অতএব আমি মহান খলিফার কাছে আররেকটু কথা বলার অনুমতি চাচ্ছি।“

“আমার কাছে মনে হচ্ছে উজির নাহুম ইবন-নাহুমের কথায় ভাল যুক্তি আছে।“ বলেন খলিফা। “আমার মনে হয় ব্যাপারটা পরিষ্কার হওয়া দরকার। অতএব আপনি বলুন। আপনার বক্তব্য শুনলে সবাই ব্যাপারটা সম্পর্কে ধারণা পাবেন।“

কক্ষে পিনপতন নীরবতা। গণনাকারী শুরু করলেন, “বিজ্ঞা উপস্থিতি ও সম্মানিত রাজা, জেনে রাখুন, গণিতের আবির্ভাব ঘটেছে মানবিক চেতনার উন্মেষের মাধ্যমে। নিছক বাস্তব প্রয়োজন বা উপযোগবাদী চিন্তা থেকে এর জন্ম হয়নি। বিজ্ঞানের এই শাখার জন্ম হয়েছে মহাবিশ্বের রহস্য উন্মোচনের বাসনা থেকে। এর ক্রমবিকাশ ঘটেছে অসীমকে জানা ও বোঝার প্রচেষ্টা থেকে। এখন, এত শ বছর পরে এসেও এই অসীমের সন্ধানেই আমরা এগিয়ে চলছি। মানুষের বস্তুগত উন্নতি নির্ভর করে এই অবস্তুগত গবেষণা ও বর্তমান যুগের বিজ্ঞানীদের ওপরই। ভবিষ্যতেও বস্তুগত উন্নতির জন্যে মানুষ বিজ্ঞানীদের দিকেই তাকিয়ে থাকবে। যারা নিছক বৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্যেই কাজ করেন। তত্ত্বের প্রায়োগিক দিক নিয়ে মাথা ঘামান না।“

বেরেমিজ একটু থেমে হালকা হেসে আবার শুরু করলেন, “একজন গণিতবিদ যখন হিসেব করেন বা সংখ্যার মধ্যে নতুন সম্পর্ক খোঁজেন, তিনি প্রায়োগিক কোনো উদ্দেশ্য খোঁজেন না। শুধু বাস্তব প্রয়োজনের জনে বিজ্ঞান চর্চা বিজ্ঞানের প্রাণশক্তিই নষ্ট করে দেয়। আজকে আমরা যেসব তত্ত্ব পড়ছি তাকে অবাস্তবসম্মত মনে হতে পারে। কিন্তু ভবিষ্যতে হয়ত সেটাই যুগান্তকারী ভূমিকা রাখবে। আজকের সমীকরণ দিয়ে কে অজানা ভবিষ্যতের সমাধান দিতে পারবে? আল্লাহই ভাল জানেন। এমনটা খুবই সম্ভব যে আজকের তাত্ত্বিক গবেষণা হয়ত এক দুই হাজার বছরের মধ্যেই বাস্তব কোনো কাজে লাগবে।

“মনে রাখতে হবে, গণিত সমস্যা সমাধান করে, ক্ষেত্রফল ও আয়তন মাপে ঠিকই। কিন্তু এর আরও উন্নত লক্ষ্য থাকে। বুদ্ধি ও যুক্তির বিকাশে গণিত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সে কারণে চিন্তা ও চেতনার শক্তি অনুভব করার জন্যে গণিত হলো একটি নিশ্চিত পন্থা।

“এক কথায়, গণিত হলো অন্যতম এক চিরন্তন সত্য। গণিত আমাদের চেতনাকে উন্নত করে সেই স্তরে নিয়ে যায়, যেখানে আমরা প্রকৃতির সৌন্দর্য অনুভব করতে পারি। অনুভব করি চিরন্তন ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর অস্তিত্ব । যেমনটা বললাম, হে মহান উজির, আপনার ছোট একটি ভুল হয়েছে। আমি কবিতার পঙতি গুনি। তারার দূরত্ব মাপি, দেশের ক্ষেত্রফল বের করি, বৃষ্টির বেগ মাপি। এগুলো করতে গিয়ে বীজগণিত ও জ্যামিতির সূত্র ব্যবহার করি। এসব হিসাব-নিকাশ ও পড়াশোনা থেকে আমার কী লাভ হবে তা নিয়ে ভাবি না। কল্পনা বা স্বপ্ন ছাড়া বিজ্ঞান নিঃস। প্রাণহীন।

বেরেমিজের জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দরবারের সবাইকে মুগ্ধ করল। খলিফা গণনাকারীর কাছে আসলেন। হাত নেড়ে নেড়ে বললেন, “স্বপ্নচারী বিজ্ঞানীর বিশ্বাস সবসময় দার্শনিক বিশ্বাসহীন সুবিধাবাদী ও অতিউচ্চাকাঙ্খী বিজ্ঞানীর নোংরামীকে পরাজিত করেছে ও করবে।“

খলিফার এমন ন্যায় ও যৌক্তিক মতামত শুনে উগ্র উজির নাহুম ইবন-নাহুম একটি কথাও না বলে সালাম দিয়ে দরবারকক্ষ ত্যাগ করল।

কবি ঠিকই বলেছিলেন,

কল্পনার হোক জয়

মোহ ছাড়া জীবন তো অন্য কিছু নয়

১৫

স্কোয়ার্ড অ্যাওয়ে

বার্তাবাহক নুরুদ্দিন খলিফার প্রাসাদে ফিরলেন। পবিত্রাত্মার কাছ থেকে যা শিখলেন তিনি। দরিদ্র ক্যালিগ্রাফারের জীবনকাহিনি। সংখ্যার বর্গ ও দাবার বোর্ড। ম্যাজিক স্কয়ার বা জাদুর বর্গ নিয়ে বেরেমিজের ভাষণ। পণ্ডিত ব্যক্তির প্রশ্ন। খলিফা বেরেমিজকে দাবার গল্প বলতে বললেন।

ক্যালিগ্রাফারকে খুঁজছিলেন নুরুদ্দিন। কিন্তু ভাগ্য খারাপ। বন্ধু সংখ্যা সম্পর্কে খলিফা যে ক্যালিগ্রাফারকে প্রশ্ন করবেন তাকে বাগদাদের কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। খলিফার নির্দেশে মানার জন্যে নুরুদ্দিন যা যা করেছে তা বলল:

“তিনজন প্রহরী নিয়ে আমি প্রাসাদ থেকে বের হই। উসমান মসজিদের দিকে রওয়ানা দিলাম। মসজিদের একজন খাদেমের সাথে কথা বললাম। তিনি জানালেন, আমি যাকে খুঁজছি তিনি কয়েকমাস কাছের একটি বাড়িতে বসবাস করেছিলেন। কয়েক দিন আগে তিনি গালিচা ব্যবসায়ীদের এক কাফেলার সাথে বসরার দিকে চলে যান। খাদেম তার নাম জানেন না। তবে ক্যালিগ্রাফার বাড়িতে একা থাকতেন। ছোট ও সাদাসিধে বাসা থেকে কমই বের হতেন তিনি। তিনি কোথা গিয়ে থাকতে পারেন সে বিষয়ে কোনো সূত্র পাব ভেবে আমি তার বাড়ির ভেতরে যাওয়া সিদ্ধান্ত নেই।

“পরিত্যাক্ত বাড়ি। দারিদ্র্যের ছাপ স্পষ্ট। একমাত্র সাজসজ্জা হলো এক কোণার একটি ভাঙা খাট। তবে একটি এবড়োথেবড়ো কাঠের টেবিলে একটি দাবার বোর্ড অ কিছু গুটি পড়ে আছে। আর দেয়ালে একটি বর্গ ও তার মধ্যে কিছু সংখ্যা। আমি অবাকই হলাম। তার মতো একজন এতটা হতদরিদ্র মানুষ দাবা খেলবে বা দেয়ালে গণিতের প্রতীক দিয়ে সাজাবে তা অকল্পনীয়। আমি দাবার বোর্ড ও সংখ্যার বর্গ আমার সাথে নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমাদের যোগ্য পণ্ডিতরা যাতে বৃদ্ধ ক্যালিগ্রাফারের রেখে যাওয়া সূত্রগুলো নিয়ে কাজ করতে পারেন।

খলিফা আগ্রহী হলেন। বেরেমিজকে দাবার বোর্ড ও বর্গটি ভালোভাবে দেখার নির্দেশ দিলেন। দরিদ্র ক্যালিগ্রাফারের চেয়ে আল-খাওয়ারিজমির কোনো অনুসারীর কাছেই তো এগুলো বেশি প্রাসঙ্গিক।

গণনাকারী দুটো জিনিসই মন দিয়ে দেখলেন। বললেন, “ক্যালিগ্রাফারের রেখে যাওয়া সংখ্যার এই বর্গকে আমরা বলি ম্যাজিক স্কয়ার। ধরুন আমরা একটি বর্গ নিলাম। এবার একে চার, নয় বা ষোলোটি সমান ঘরে ভাগ করলাম। প্রতিটি ঘরে একটি সংখ্যা বসাই। যেকোনো সারি, কলাম বা কর্ণের (কোণাকোণি) সংখ্যাগুলোর যোগফল সমান হলে আমরা পাই জাদুর বর্গ। প্রাপ্ত যোগফলকে বলা হয় বর্গের ধ্রুবক। যেকোনো সারিতে ঘরের সংখ্যাকে বলা হয় বর্গের পরম মান। প্রতিটি আলাদা ঘরের সংখ্যাগুলোকে হতে হবে ভিন্ন ভিন্ন। শুধু চারটি ঘর নিয়ে জাদুর বর্গ বানানো সম্ভব নয়।

“জাদুর বর্গের উৎপত্তি কীভাবে তা কেউ বলতে পারে না। অতীতে কৌতূহলী মানুষের সময় কাটানোর অন্যতম হাতিয়ার ছিল এগুলো বানানো। প্রাচীনকালে মানুষ কিছু অনন্য গুণাবলীকে সংখ্যা দিয়ে প্রকাশ করত। সে সংখ্যাগুলোর ঠাঁই হয়েছে বর্গেও। মুহাম্মাদের (সা) ৪৫০০ বছর আগেও চীনা গণিতবিদরাও এগুলো সম্পর্কে জানতেন। ভারতে এই মন্ত্র জাদুমন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হত। ইয়েমেনের এক পণ্ডিত মনে করতেন, জাদুর বর্গ কিছু কিছু রোগ ভাল করতে পারে। কোনো কোনো গোত্রের ধারণা ছিল, রূপা দিয়ে বানানো জাদুর বর্গ গলায় পরলে প্লেগ থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। ওষুধবিদ্যা চর্চাকারী প্রাচীন ইরানীয়রা দাবি করত জাদুর বর্গ দিয়ে রোগ ভাল করা যায়। তারা ভাবত এর মাধ্যমে *প্রিমাম নন নচেরে* বা *প্রথম কাজ আঘাত থেকে বেঁচে থাকা* নীতির প্রয়োগ হচ্ছে।

চিত্র ১৫.১: নয় সংখ্যার একটি জাদুর বর্গ

“তবে গণিত জাদুর বর্গের একটি দারুণ বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন, জাদুর বর্গকে ভেঙে অন্য জাদুর বর্গ বানানো গেলে তাকে বলে উচ্চতর জাদুর বর্গ। কোনো কোনো উচ্চতর জাদুর বর্গকে বলে ডায়াবোলিক্যাল।

খলিফা ও সভাসদ এতক্ষণ বেরেমিজকে খেয়াল করছিলেন। সভাসদের মধ্যে একজন বৃদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। চোখ দুটো উজ্জ্বল। নাক চ্যাপ্টা। কথাবার্তা ও আচরণ মার্জিত। বেরেমিজের প্রশংসা করে তাঁর মতামত প্রকাশ করার অনুমতি প্রার্থনা করলেন।

চিত্র ১৫.২: যেকোনো সারি, কলাম বা কর্ণকে যোগ করলে ৩৪ হবে। আরও নানানভাবে যোগ করেও একই সংখ্যা পাওয়া সম্ভব। চার কোণার সংখ্যাগুলো যোগ করলেও ৩৪ হয়। সত্যি বলতে, এই যোগফল পাওয়ার ৮৬টি আলাদা পদ্ধতি আছে।

তাঁর প্রশ্নটি হলো, “জ্যামিতির কোনো বিশেষজ্ঞের পক্ষে কি বৃত্তের পরিধি ও ব্যাসের নিখুঁত সম্পর্ক খুঁজে বের করা সম্ভব?”

গণনাকারী উত্তর দিলেন, “বৃত্তের ব্যাস জানলেও পরিধি একদম নিখুঁত করে বের করা সম্ভব নয়। একটি প্রকৃত সংখ্যা থাকার কথা। তবে জ্যামিতিবিদরা সেটা জানেন না। প্রাচীন জ্যোতিষীরা মনে করত যেকোনো বৃত্তের পরিধি তার ব্যাসের তিন গুন। কিন্তু সেটা সঠিক নয়। গ্রিক গণিতবিদ আর্কিমিডিস বের করেন, পরিধি ২২ কিউবিট হলে ব্যাস প্রায় ৭ কিউবিট হয়। অতএব বৃত্তের পরিধি ও ব্যাসের অনুপাত সংখ্যাটি ২২ ও ৭ এর অনুপাতের সমান হওয়া উচিত। হিন্দু গণিতবিদরা এর সাথে একমত নন। আর মহান আল-খাওয়ারিজমির মতে আর্কিমিডিসের এই নিয়ম বাস্তবতা অনেক দূরে অবস্থান করছে। ১

চ্যাপ্টা নাকের পণ্ডিতের দিকে তাকিয়ে বেরেমিজ কথা শেষ করতে গিয়ে বললেন, “এই সংখ্যাটি রহ্যসের চাদরে ঢাকা। এর কিছু কিছু গুণাবলী শুধু আল্লাহই জানেন।“

এরপর গণনাকারী দাবার বোর্ড হাতে নিলেন। খলিফাকে বললেন, “পুরনো এই বোর্ডে ৬৪টি সাদা-কালো বর্গাকার ঘর আছে। আপনি জানেন, এটা দিয়ে দারুণ এক খেলা হয়। লাহুর সেসা নামে একজন হিন্দু ভারতীয় রাজাকে খুশী করতে এটি আবিষ্কার করেন। দাবার সাথেও একটি গল্প জড়িয়ে আছে। এই গল্পে আছে সংখ্যা, হিসাব ও দারুণ কিছু নির্দেশনা।

“আমি সেটা শুনতে চাই।“ খলিফা বললেন। “এটা শুনতে নিশ্চয় ভাল লাগবে।“

“শুনলাম ও মেনে নিলাম।“ বেরেমিজের উত্তর।

এ বলে বেরেমিজ বললেন সে গল্প, যা আমরা পরের অধ্যায়ে দেখব।

অনুবাদকের নোট

১। এই মানই হলো পাই (π), যার আসন্ন মান ৩.১৪১৬। একটি অমূলদ সংখ্যা। মানে দশমিকের পরে এতে অসীমসংখ্যক অঙ্ক আছে। যেকোনো বৃত্তের পরিধি ও ব্যাসের অনুপাত এই সংখাটির প্রকৃত মান বের করা তাই কখনোই সম্ভব নয়। তবে কম্পিউটারের সাহায্যে ক্রমেই বেশি বেশি অঙ্ক সঠিক করে বের করা হচ্ছে। কিন্তু অসীমসংখ্যক অঙ্ক তো আর কোনোদিনই বের করে শেষ করা সম্ভব নয়। অমূলদ সংখ্যা বলে কথা। একই কারণে একে আসলে দুটি সংখ্যার অনুপাত আকারে প্রকাশ করাও সম্ভব নয়।

১৬

গেম প্ল্যান



দাবার উৎপত্তির গল্প। গণনাকারী বেরেমিজ সামির বাগদাদের খলিফা আমিরুল মুমিনিন আল-মুতাসিম বিল্লাহকে গল্পটি শোনাচ্ছেন।

প্রাচীন ভারতে যাদব নামে একজন রাজপুত্র ছিলেন। তেলাঙ্গনা প্রদেশের শাসনভার ছিল তার হাতে। তিনি ঠিক কোন সময়ে রাজত্ব করতেন তা প্রাচীন নথিপত্র ঘেঁটে পুরোপুরি সঠিকভাবে বলা সম্ভব নয়। তবে বললে অত্যুক্তি হবে না, অনেক হিন্দু ইতিহাসবিদ তাকে সে সময়ের অন্যতম বিত্তশালী ও মহানুভব রাজা মনে করেন।

একের পর এক ভয়াবহ যুদ্ধে রাজা যাদবের জীবন অতিষ্ট হয়ে ওঠে। রাজকীর সুখ-স্বাচ্ছ্যন্দ্য এসব দুঃখ-কষ্টের আড়ালে চাপা পড়ে যায়। এক সময় কালিয়ানের রাজপুত্র অভিযাত্রী ভরঙ্গুল আকস্মিকভাবে এক নারকীয় হামলা করে বসে। প্রজার শান্তি অক্ষুণ্ন রাখা যাদবের রাজকীয় দায়িত্ব। তাই নিজের তরবারি কোষমুক্ত করে ফৌজের নেতৃত্ব নিজের হাতে তুলে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

“দুই পক্ষের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে দক্ষিণের ময়দান লাশে পূর্ণ হয়ে যায়। সিন্ধু নদীর পানি রক্তে লাল হয়ে ওঠে। ইতিহাসবিদদের মতে রাজা যাদবের দুর্লভ এক সামরিক গুণ ছিল। আক্রান্ত হওয়ার আগেই তিনি ঠান্ডা মাথায় পরিকল্পনা করে রাখেন। এরপর সুনিপুণ দক্ষতার সাথে তা ময়দানে প্রয়োগ করেন। তাঁর রাজ্যের শান্তি নষ্ট করতে আসা হানাদারদের সমূলে ধ্বংস করে ছাড়েন।

“তবে উগ্র ভরঙ্গুলের বিপক্ষে বিজয় অর্জন করতে গিয়ে তাঁকে অনেকগুলো সৈনিকের প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়। সিংহাসন ও রাজ্য বাঁচাতে অনেক তরুণ সৈনিক প্রাণ বিলিয়ে দেন। যুদ্ধের ময়দানে নিহত হয়ে পড়ে থাকাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন যাদবের পুত্র রাজকুমার আদজমির। তীর লেগে বুক এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে আছে। এই রাজপুত্রই শেষ মুহূর্তে প্রতিরোধ গড়ে তুলে নিজ দলের বিজয় নিশ্চিত করেন।

“রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শেষ হলো। দেশের সীমানা সুরক্ষিত হলো। রাজা ফিরে এলেন অন্দ্রের সুরম্য রাজপ্রাসাদে। তবে তিনি এবারে হিন্দুদের ঐতিহ্যবাহী বিজয়মিছিল ও হৈ-হুল্লোড় কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করলেন। নিজেও পড়ে রইলেন অন্দরমহলে। প্রজাদের কোনো ভাল কাজে প্রয়োজন হলেই কেবল বেরিয়ে বিজ্ঞ উজিরদের সাথে পরামর্শ করেন।

“সময়ের সাথে বেদনাদায়ক সেই যুদ্ধের স্মৃতি মুছে যায়নি। বরং আরও খারাপ হলো। শোক ও বেদনায় ডুবে গেলেন রাজা যাদব। কী হবে মনোরম প্রাসাদ, যুদ্ধহস্তি আর বিপুল ধনরাজি দিয়ে, যদি জীবনকে অর্থবহ করে তোলা জিনিসটাই না থাকে? জাগতিক সম্পদের কী মূল্য আছে একজন শোকার্ত বাবার কাছে, যে তার হারানো ছেলেকে কখনোই ভুলতে না পারে?

“ছেলেকে হারানো সেই যুদ্ধের স্মৃতি তাকে বারবার তাড়া করে ফিরছে। বালুর ওপরে নিজের দলের সৈন্যদের গতিবিধির চিহ্ন এঁকে এঁকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব্যয় করেন। একটি রেখা দিয়ে পদাতিক বাহিনীর এগিয়ে যাওয়ার চিহ্ন আঁকেন। সমান্তরালে আরেক রেখায় আঁকেন যুদ্ধহস্তির এগিয়ে যাওয়ার দৃশ্য। একটু নিচে আছে কিছু প্রতিসম বৃত্ত। এখানে রয়েছে এক বৃদ্ধ সেনাপতির নেতৃত্বে অশ্বারোহী দল। আর মাঝে আঁকলেন শত্রু বাহিনীর অবস্থান। রাজার পরিকল্পনার ফলে তাদের অবস্থান হয়েছে খুন নাজুক জায়গায়। এর ফলেই তারা খুব সহজে ও চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয়েছিল।

“যুদ্ধের এই চিত্র যতটা মনে আছে খুব সূক্ষ্মভাবে আঁকা শেষ করে আবার মুছে ফেললেন। আবার শুরু করলেন আঁকা। যেন এর মাঝেই তিনি অতীতের দুঃখ ভোলার উপায় খুঁজে পেয়েছেন।

“খুব সকাল। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণরা প্রাসাদে এলেন বেদবাণী শুনতে। রাজা ততক্ষণে বালির ওপর যুদ্ধের নির্দেশনামা লিখেছেন ও মুছে ফেলেছেন। সেগুলো তিনি না পারছেন ভুলতে আর না পারছেন বারবার না এঁকে থাকতে।

“ ‘হে অসুখী রাজা,” কোমলস্বরে বললেন পুরোহিত, “ঈশ্বর যাকে যুক্তি থেকে বঞ্চিত করেছেন সে দাসের মতো জীবন যাপন করে। শক্তিশালী ও দয়ালু ধন্যতারাই কেবল তাকে বাঁচাতে পারে।‘

“ব্রাহ্মণরা সুগন্ধী শিকড় জ্বেলে রাজার জন্যে প্রার্থনা করলেন। চিরন্তন রক্ষাকর্তার কাছে তেলাঙ্গনার রাজার জন্য সাহায্য প্রার্থনা করলেন। একদিন রাজাকে জানানো হলো, একজন তরুণ, বিনয়ী ও দরিদ্র ব্রাহ্মণ দরবারে আসতে চায়। এর আগে সে অনেকবার আসতে চেয়েছে। রাজা প্রত্যেকবার ফিরিয়ে দিয়েছেন। বলেছিলেন, কারও সাথে দেখা করার মতো অবস্থা তাঁর নেই। তবে এবার তিনি তরুণ আগন্তুককে নিজের সামনে আসার অনুমতি দিলেন।

“দরবারকক্ষে আসার পরে প্রথা অনুসারে রাজার একজন সহকারী তরুণ ব্রাহ্মণকে প্রশ্ন করলেন, ‘আপনি কে? কোত্থেকে এসেছেন? বিষ্ণুর ইচ্ছায় আপনি রাজাকে কী বলতে এসেছেন?’

“ ‘আমার নাম, ‘ ব্রাহ্মণ বললেন, ‘লাহুর সেসা। আমি এসেছি নামির গ্রাম থেকে। এই সুন্দর শহর থেকে ত্রিশ দিনের হাঁটা পথ। আমি সেখানে বসে শুনলাম আমাদের রাজা অসহনীয় মনোকষ্টে আক্রান্ত। তাঁর ছেলের যুদ্ধে নিহত হওয়ায় দুঃখে ভারাক্রান্ত তিনি। আমি ভাবলাম, রাজা আমাদের মহান রাজা নিজেকে প্রাসাদের মধ্যে আটকে ফেললে তো ভয়াবহ ব্যাপার হবে। এ তো ব্যথার কাছে হার মানা এক অন্ধ ব্রাহ্মণের মতো অবস্থা। এজন্যে আমি ভাবলাম একটি খেলা আবিষ্কার করব, যা তাঁকে ব্যস্ত রাখবে ও তাঁর মনকে আনন্দময় জিনিসের দিকে আকৃষ্ট করে তুলবে।‘

“ইতিহাসের অন্যসব রাজপুত্রের মতোই হিন্দু রাজা অত্যন্ত কৌতূহলবোধ করলেন। তিনি দেখলেন, তরুণ ব্রাহ্মণ নতুন ও অজানা এক খেলার প্রস্তাব দিচ্ছে। তিনি দেরি না করেই সেটা চেখে দেখতে চাইলেন।

“সেসা রাজা যাদবের সামনে সমান আকারের ৬৪টি বর্গবিশিষ্ট একটি বোর্ড নিয়ে আসলেন। সাথে সাদা ও কালো রংয়ের দুই গুচ্ছ গুটি। গুটিগুলোয় কাঁচা হাতে তৈরি বিভিন্ন প্রাণীর অবয়ব। বোর্ডের দুই পাশে দু রংয়ের গুটি বসানো হলো। গুটির চলাচলের রয়েছে অদ্ভুত নিয়ম।

“সেসা ধৈর্য্যের সাথে রাজা ও দরবারীদের সামনে খেলার উদ্দেশ্য ও নিয়ম ব্যাখ্যা করলেন। দুই খেলোয়ারের প্রত্যেকের থাকবে আটটি সৈনিক (বোড়ে) গুটি। এগুলো যুদ্ধের ময়দানে শত্রুকে মোকাবেলা করা পদাতিক বাহিনীর প্রতীক। পদাতিক বাহিনীর পেছনে থাকবে আকারে বড় ও শক্তিশালী হাতি (গজ)। খেলায় ব্যবহার আছে ঘোড়ারও। এই অবয়বের দুটি গুটি ঘোড়ার মতোই লাফিয়ে অন্য গুটি পার হতে পারবে। আক্রমণকে সুসংহত করতে আছেন রাজার দুজন সম্ভ্রান্ত যোদ্ধা।১ আরেকটি গুটি মানুষের দেশাত্মবোধক চেতনার ধারকবাহক। এর নাম রানী। এই গুটি অনেক দিকে চলাচল করতে পারে। অন্যসব গুটির চেয়ে শক্তিশালী। সবশেষে একটি গুটি আছে যার ক্ষমতা বেশি নয়। তবে অন্য গুটির সহায়তা পেলে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এর নাম রাজা।

“রাজা যাদব খেলার প্রতি আগ্রহী হলেন। উদ্ভাবককে প্রশ্ন করলেন:

“ ‘রাজার চেয়ে রানী বেশি শক্তিশালী কেন?’

“ ‘কারণ, “বললেন সেসা, “এই খেলায় রানী হলেন মানুষের চেতনার প্রতীক। সিংহাসনের শক্তি নিহিত থাকে প্রজার সমৃদ্ধিতে। প্রজাদের চেতনা ও প্রত্যয় ছাড়া রাজা কীভাবে শত্রুকে প্রতিহত করবেন? এই চেতনাই তো জাতির রক্ষাকবচ। ‘

“রাজা দ্রুতই খেলার নিয়ম শিখে ফেললেন। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই প্রীতি খেলায় হারিয়ে দিলেন দরবারীদের। মাঝেমধ্যে সেসা নাক গলালেন। সমস্যা থাকলে বুঝিয়ে দিলেন। অথবা অপেক্ষাকৃত ভাল চাল বলে দিলেন।

“এক সময় রাজা অবাক হয়ে খেয়াল করলেন, অনেকবার চালাচালি করার পর গুটিগুলোর অবস্থান ঠিক দক্ষিণার যুদ্ধের মতো হয়ে গেল।

“ ‘দেখুন,’ তরুণ ব্রাহ্মণ বললেন, ‘এই যুদ্ধে জিততে হলে এই সম্ভ্রান্ত যোদ্ধাকে প্রাণ বিসর্জন দিতে হবে।…’

“তিনি বোর্ডের সম্মুখসারির নেতৃত্বে থাকা গুটির দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। এভাবে বিজ্ঞ সেসা দেখিয়ে দিলেন, কখনও কখনও মানুষের শান্তি মুক্তি অর্জনের জন্যে রাজপুত্রকে প্রাণ দিতে হয়।

“এ কথা শুনে রাজা প্রাণোচ্ছ্বল হয়ে উঠলেন। বললেন, ‘আমি ভাবতেই পারিনি কেউ এমন মজার ও শিক্ষামূলক খেলা বানাতে পারবে। এই গুটিগুলো চালিয়ে আমি বুঝলাম, প্রজার সমর্থন ও স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছাড়া রাজা অসহায়। আর কখনও কখনও বিজয় অর্জনের জন্যে একটি বোড়ে বিসর্জন দেওয়া একটি শক্তিশালী গুটি বিসর্জন দেওয়ার সমান গুরুত্ব রাখে।‘

“তরুণ ব্রাহ্মণের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, ‘বন্ধু, এই অপূর্ব উপহারের জন্যে আমি তোমাকে পুরস্কৃত করতে চাই। আমার মনোবেদনা দূর করতে এটি দারুণ ভূমিকা রেখেছে। বলো, তুমি কী চাও। আমার সাধ্যের মধ্যে থাকলে আমি দেব। আমি যাতে প্রমাণ করতে পারি যোগ্যতাকে আমি কীভাবে কৃতজ্ঞতার চোখে দেখি।‘

“রাজার মহান প্রস্তাব সেসার মধ্যে খুব বেশি ভাবান্তর ঘটাল না। তার শান্ত মুখে নেই কোনো উত্তেজনা, আনন্দ বা বিস্ময়। তরুণ ব্রাহ্মণের এই উদাসীনতা সভাসদকে অবাক করল।

“ ‘হে দয়াল রাজা,’ কণ্ঠে সংযম ও দৃঢ়তা বজায় রেখে বলল যুবক, ‘আমি আমাদের রাজার অপরিসীম দুঃখ দূর করতে পেরেছি। এতে আমি সন্তুষ্ট। এর বেশি কোনো পুরস্কার আমি কামনা করি না। অতএব, আমার পুরস্কার আমি পেয়েই গেছি। অন্য পুরস্কারের একদম দরকার নেই।‘

“রাজা খানিকটা তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলেন। লোভী লোকের ভীড়ে এমন অর্থের প্রতি উদাসীন এমন দুর্লভ লোক কোত্থেকে এল! যুবকের উত্তর রাজাকে হতভম্ব করল। আবার বললেন, ‘জাগতিক জিনিসের প্রতি তোমার অবহেলা ও উদাসীনতা আমাকে অবাক করছে। অতিরিক্ত বিনয় হলো এমন বাতাস যা আলো নিভিয়ে দিয়ে রাতের অন্ধকারের বৃদ্ধ মানুষকে বিপদে ফেলে দেয়। তাই জীবন চলার পথে বিভিন্ন বাধা দূর করতে হলে চাই একটি উচ্চাকাঙ্খা, যা মানুষকে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করবে। অতএব, একটি উপযুক্ত পুরস্কার দাবি করতে দ্বিধা করো না। তুমি এক বস্তা সোনা চাও? এক সিন্ধুক অলঙ্কার? রাজপ্রাসাদ দিলে কেমন হয়? নাকি একটি প্রদেশের শাসক হবে? ভেবে দেখো কী করবে। আমি আমার কথার সম্মান রেখে তোমার হাতে পুরস্কার তুলে দেব।‘

“ ‘এত কিছু বলার পর আপনার প্রস্তাব ফিরিয়ে দেওয়া বেয়াদবি হয়।‘ সেসা জবাব দিলেন। ‘আমি আমার উদ্ভাবিত খেলার জন্য পুরস্কার নেব। আপনার মহানুভবতার সাথে মানানসই পুরস্কারই চাইব। তবে সোনা, জায়গা বা প্রাসাদ চাই না আমার। আমি চাই গম।‘

“ ‘গম?’ রাজা বিস্ময়ে হতবাক। ‘এমন তুচ্ছ পুরস্কার কীভাবে চাইলে!’

“ ‘এর চেয়ে সরল আর কিছু হয় না।‘ সেসা ব্যখ্যা করতে শুরু করলেন। ‘বোর্ডের প্রথম বর্গ ঘরের জন্য আমাকে একটি গম দেবেন। দ্বিতীয় ঘরের জন্য দুইটি। তৃতীয় ঘরের জন্য চারটি। চতুর্থ ঘরের জন্য আটটি। এভাবে প্রতি ঘরের জন্য আগের ঘরের দ্বিগুণ দিতে দিতে বোর্ডের সর্বশেষ ৬৪তম ঘরে যাবেন। মহামান্য রাজা, আমি অনুনয় করছি, আপনার মহান প্রস্তাবের বিপরীতে আমাকে এভাবেই প্রতিদান দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।‘

“এমন অদ্ভুত অনুরোধ শুনে রাজা হাসলেন। সভাসদও হাসিতে ফেটে পড়ল। উপস্থিত ব্রাহ্মণ ও বাকি সবাইও হাসল। বিশেষ করে অবাক হলো তারা, যারা সেসার চেয়ে বেশি করে জাগতিক মোহের প্রতি আকৃষ্ট ছিল।

“ ‘গবেট!’ রাজা চিৎকার করে উঠলেন। ‘তুমি সম্পদকে এমন তাচ্ছিল্য করতে শিখলে কোথায়? তোমার অনুরোধটা খুবই অদ্ভুত। তুমি জানো, এক মুঠোয় অনেকগুলো গম ধরে। তোমার প্রতে ঘরে আগের ঘরের দ্বিগুণের সূত্র দিয়ে প্রাপ্য গমগুলো কয়েক মুঠো গম দিয়েই আমি আদায় করে দিতে পারি। চাইলে কিছু বেশিও দিয়ে দিতে পারি। তোমার চাওয়া এই পুরস্কারের গম দিয়ে আমার সবচেয়ে ছোট গ্রামটিকেও দুয়েকদিনের বেশি চলানো যাবে না। কিন্তু কথা যখন দিয়েছি, তুমি যা চেয়েছ তাই পাবে।‘

“রাজা দরবারের সেরা গণিতবিদদের ডাকলেন। সেসা কতটি গম পাবে বের করতে বললেন। কয়েক ঘণ্টা ঘাম ঝরিয়ে হিসেব শেষ করে বিজ্ঞ গণনাকারীরা রাজার সামনে হাজির হলেন।

“রাজা দাবা খেলছিলেন। খেলা থামিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ‘পুরস্কার হিসেবে সেসা কয়টি গম পাচ্ছে?’

“ ‘মহানুভব রাজা!’ প্রধান গণিতবিদ জানালেন, ‘আমরা গমের সংখ্যা বের করেছি। পেয়েছি এমন একটি যোগফল যা কল্পনারও অতীত। এতগুলো গম রাখার জন্য কী পরিমাণ জায়গা লাগবে তাও আমরা বের করেছি। ধরুন সবগুলো গম দিয়ে আমরা একটি পাহাড় বানালাম। তাহলে সেই পাহাড়ের ভিত্তি হবে তেলাঙ্গনার সমান। আর উচ্চতা হবে হিমালয় পর্বতের দশ গুন। সমস্ত ভারতে আগামী ১০ লক্ষ বছর ধরে গম আবাদ করলেও যুবক সেসার প্রাপ্য গম উৎপাদন করা সম্ভব হবে না।‘২

“এ শুনে রাজা ও সভাসদের বিস্ময় কোন পর্যায়ে গেল তা বর্ণনার অতীত। হিন্দু রাজা প্রথমবার বুঝলেন, এই প্রতিশ্রুতি তাঁর সাধ্যের অতীত।

“ইতিহাসবিদরা বলেন, লাহুর সেসা একজন ভদ্র প্রজা ছিলেন। রাজাকে কষ্ট দেওয়ার কোনো ইচ্ছা ছিল না তার। তিনি সবার সামনে তাই পুরস্কারটি নেওয়া ইচ্ছা বাতিল করেন। রাজাকে দেন দায়মুক্তি। বললেন:

“ ‘ব্রাহ্মণরা যে কথা বারবার বলেন সেটা একটু ভেবে দেখুন। সেরা বুদ্ধিমানরাও অনেকসময় সংখ্যার মুখোশ দেখে প্রতারিত হন। প্রতারিত হন নিরেট উচ্চাকাঙ্খীদের অতিবিনয় দেখেও। সেই তো অসুখী যে এমন ঋণ কাঁধে নেয় যা হিসেব করার সামর্থ্যও তার বুদ্ধির অতীত। জ্ঞানী তো সেই যে প্রশংসা করে বেশি, কিন্তু প্রতিশ্রুতি দেয় অল্প।

“একটু থেমে তিনি বললেন, ‘জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে আমরা ব্রাহ্মণদের শেখানো বিজ্ঞানের চেয়ে বেশি শিখি। অথচ অভিজ্ঞতার শিক্ষাটাকে কেউ দাম দিতে চায় না। একজন মানুষ যত বেশিদিন বাঁচে তত বেশি নৈতিক ঝামেলায় পড়ে। এই বিষণ্ণ তো এই সুখী। মেজাজ এই গরম তো এই ঠান্ডা। উচ্চাভিলাষী আবার অলস। ক্ষণে ক্ষণে তা পাল্টায়। আধ্যত্মিকতার ধারণাবাহী সত্যিকার জ্ঞানীরাই এসব ঝামেলা ও মনমেজাজে খামখেয়ালিপনার উর্ধ্বে থাকতে পারেন।

“এই অপ্রত্যাশিত ও জ্ঞানগর্ভ কথাগুলো রাজার চেতনায় ছাপ ফেলল। তিনি গমের পাহাড়ের কথা ভুলে গেলেন। সেসাকে বানালেন সভাসদ প্রধান।

“লাহুর সেসা দাবার পাশাপাশি এবার রাজাকে বুদ্ধি-পরামর্শ দিয়েও সহযোগিতা করলে লাগলেন। তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত পরামর্শে দেশের সুরক্ষা ও শান্তি-সমৃদ্ধিও বাড়তে লাগল।“

দাবার উৎপত্তি সম্পর্কে বেরেমিজের গল্পে খলিফা মুগ্ধ হলেন। প্রধান লেখককে ডেকে সেসার কাহিনি তুলার কাগজে লিখে রূপার সিন্ধুকে সংরক্ষণ করতে আদেশ দিলেন।

এরপর মহানুভব খলিফা ভাবছিলেন বেরেমিজকে কী উপহার দেবেন। দামী জুব্বা নাকি এক শটি স্বর্ণ মুদ্রা।

“আল্লাহ পৃথিবীর সাথে কথা বলেন দয়াবানদের হাতের মাধ্যমে।“

বেরেমিজের এমন মহৎ কথায় সবাই খুশী হলেন। দরবারীরা ছিলেন উজির মালুফ ও কবি ইয়াজিদের বন্ধু। বেরেমিজের কথা শুনে তারাও সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল।

উপহারের জন্যে খলিফাকে ধন্যবাদ দিয়ে বেরেমিজ কক্ষ থেকে বের হয়ে এলেন। খলিফা তখন অন্য কাজে মনযোগ দিলেন। আমরা গোধূলির সময় প্রাসাদ ছেড়ে বের হয়ে আসলাম। আকাশে শাবান মাসের চাঁদ দেখা গেল।

অনুবাদকে নোট

১। এর সাথে আধুনিক দাবার সেটআপ মিলবে না। এটা ছিল একদম প্রাথমিক সংস্করণ।

২। আরও বিস্তারিত জানতে পড়ুন: <https://www.statmania.info/2017/09/chess-story.html> লিঙ্কে দাবার উদ্ভাবক কত বস্তা গম পেতেন লেখাটি। এখানে কয়টি গম হয় সূত্র দিয়ে বের করে দেখানো হয়েছে। বস্তায় রাখলে কত বস্তা হবে তাও দেখানো হয়েছে। উৎপাদন করতে কত বছর লাগবে সেটা বের করে পৃথিবীর বয়সের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

১৭

আপেল ও পিঁপড়া



গণনাকারীকে অনেক প্রশ্ন করা হলো। বিশ্বাস ও কুসংস্কার। সংখ্যা ও চিত্র। ইতিহাসবিদ ও গণনাকারীগণ। নব্বই আপেলের গল্প। বিজ্ঞান ও দানশীলতা।

খলিফার সাথে প্রথমদিন দরবারের বসার সুযোগ পাওয়ার সেই বিখ্যাত দিনটির পরেই আমাদের জীবনে আমূল পরিবর্তন আসে। বেরেমিজের খ্যাতি লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে যেতে লাগল। আমাদের সাদাসিধে মুসাফিরখানায় মানুষ ভীড় করতে লাগল। অভিবাদন ও সম্মানের বৃষ্টির মতো আসতে থাকল।

গণনাকারীর কাছে প্রতিদিন ডজন ডজন প্রশ্ন আসতে লাগল। কর সংগ্রহকারীরা এল জানতে এক *আবাছে* কত *রাতল* হয় জানতে। আর এ দুটোর কতটি নিয়ে হয় *কেত*। ডাক্তারও আসল প্রশ্ন নিয়ে। জানতে চাইল, কীভাবে একটি রশিতে সাতটি গিঁট দিয়ে কীভাবে জ্বর সারিয়ে তোলা যাবে। উটচালক ও ধূপ ব্যবসায়ীরা এল অনেকবার। গণনাকারীর কাছে প্রশ্ন: কয়বার আগুনের উপর দিয়ে ঝাঁপ দিলে ভূতের আছর দূর হয়? মাঝমধ্যে রুক্ষ মুখাবয়বের তুর্কি সেনারা আসত। জানতে চাইত কী করে বিভিন্ন খেলাধুলায় জয় নিশ্চিত করা যায়। কখনও আবার নেকাবে মুখ ঢাকা মহিলারা আসত। জিজ্ঞেস চাইত, ভাগ্য, আনন্দ বা সম্পদের জন্যে কোন সংখ্যাগুলো মঙ্গলময়।

সবগুলো প্রশ্নই বেরেমিজ ধৈর্য্য ও আগ্রহ নিয়ে শুনতেন। কাউকে দিতেন ব্যাখ্যা। আর কাউকে উপদেশ। অশিক্ষিতদের কুসংস্কার দূর করার চেষ্টা করতেন। দেখিয়ে দিতেন, আল্লাহর ইচ্ছা অনুসারে সংখ্যার সাথে মানুষের হৃদয়ের আনন্দ, দুঃখ ও উদ্বেগের কোনো সম্পর্ক নেই।

এসব প্রশ্নবাণে জর্জরিত হয়েও তিনি মানুষের উপকারে আসতে পেরে আনন্দিত হতেন। কোনো কিছু পাওয়ার আশা করতেন না। কেউ টাকা দিতে চাইলেও নিতেন না। একবার এক ধনী শেখের এক সমস্যা সমাধান করে দিলে তিনি টাকা নেওয়ার জন্যে পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। বেরেমিজ টাকার থলেটা নিলেন। শেখকে ধন্যবাদ দিয়ে এলাকার দরিদ্রদের আমঝে টাকাটা বিলিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন।

একবার এলেন আজিজ নোমান নামে এক বণিক। হাতে সংখ্যায় ভর্তি এক গাদা কাগজ। তার ব্যবসায়ের অংশীদারের বিরুদ্ধে অভিযোগ দিলেন লোকটি মারাত্মক প্রতারণা করছে। বললেন সে এক জঘন্য শিয়াল। এমনই আরও কিছু বিশেষণ বললেন। বেরেমিজ লোকটিকে শান্ত করলেন।

“হঠাৎ সিদ্ধান্ত থেকে সাবধান থাকবেন।“ বেরেমিজ বললেন। “কারণ অনেকসময় এর ফলে সত্যটা বোঝা যায় না। যে রঙিন চশমা পরে থাকে সে সবকিছুকে চশমার রংয়ে দেখে। চশমা লাল হলে সবকিছুকে রক্তের মতো লাগে। চশমা হলুদ হলে মনে সবকিছুকে মধু মনে হতে পারে। আবেগও মানুষের চোখের এক চশমার মতো। কারও প্রতি আমরা সন্তুষ্ট থাকলে তার জন্য শুধু প্রশংসা আর দয়াই আসে। কাউকে পছন্দ না হলে তার সবকিছুকে আমরা খারাপ বলে ফেলি।

এবার তিনি কাগজের লেখার দিকে মনোযোগ দিলেন। দেখলেন তাতে অনেকগুলো ভুল যোগফলকে অসঠিক করে ফেলেছে। আজিজ বুঝলেন, তিনি তার সঙ্গীর প্রতি অন্যায় করেছেন। বেরেমিজের বুদ্ধিদীপ্ত ও চিন্তাশীল আচরণে দারুণ খুশী হলেন। সে রাতে তার সাথে শহরটা ঘুরে বেড়ানোর দাওয়াত দিলেন আমাদেরকে।

তিনি আমাদেরকে উসমানীয় প্লাজার ক্যাফে বাজারিকে নিয়ে গেলেন। ক্যাফের এক কক্ষে একজন ইতিহাসবিদ বসা। ধোঁয়ায় ভর্তি কক্ষটিতে তিনি মানুষকে গল্প শুনিয়ে মুগ্ধ করছেন।

আমাদের ভাগ্য ভাল। আমরা পৌঁছলাম ঠিক যখন শেখ আল-মেদাহ ভূমিকা শেষ করে গল্প শুরু করতে যাচ্ছেন। তাঁর বয়স প্রায় পঞ্চাশ। চেহারা কালো। দাঁড়ির রংও প্রায় একই। কিন্তু চোখ দুটো উজ্জ্বল। বাগদাদের অন্যান্য গল্পকথকদের মতোই তিনিও বিশাল এক খণ্ড সাদা কাপড় দিয়ে মাথা পেঁচিয়ে রেখেছেন। তাতে আছে উটের পশম দিয়ে বানানো দড়িও। এ পোশাকে তাঁকে প্রাচীনকালের পুরোহিতদের মতো লাগছিল।

বেশ কিছু মনোযোগী শ্রোতা জড় হয়েছে তাঁর চারপাশে। তাঁর জোরালো কণ্ঠটি মাঝেমাঝে কেঁপে উঠছিল। কথার তালে তালে বেজে উঠছিল বীণা ও ঢাক। শেখের কন্ঠে দারুণ নাটকীয়তা। কথা বলতেও ওস্তাদ। ঘটনার প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে চেহারায়ও। মনে হচ্ছে তাঁর বলা গল্পের ঘটনা যেন তার নিজের সাথে ঘটেছে। দীর্ঘ ভ্রমণের গল্প বলার সময় তাঁর কন্ঠে পাওয়া যায় ক্লান্ত উটের নিঃশ্বাস। কখনও আবার তাঁর মুখ হয়ে যায় পানি খুঁজে মরা বেদুইনের ক্লান্তি। মাঝেমধ্যে তো তাঁর মাথা ও কাঁধ এমনভাবে বেঁকে যেত যে মনে হত তিনি হতাশায় একদম মুষড়ে পড়েছেন।

গল্পকথকের ভাষায় শ্রোতারা দেখতে পেত আরব, আর্মেনীয়, মিশরীয়, ইরানি ও হেজাযের যাযাবরদের। তাঁর প্রশংসা না করে উপায় নেই। এই মেধাবী ও বুদ্ধিমান মানুষটার রুক্ষ মুখের আড়ালে ছিল গভীর অনুভূতিসম্পন্ন চোখজোড়া। তিনি একবার এপাশে যান তো আবার ওপাশে যান। একবারে পেছনে আসেন তো আবার যান সবার মাঝে। কখনও হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফেলেন। কখনো হাত ছুঁড়ে মারেন আকাশের দিকে। বাতাসে কথামালা ভাসিয়ে দিতেই বাদকরাও ঢোলের শব্দে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে তোলে।

গল্প শেষ না হতেই করতালির শব্দে কানা তালা। মানুষ তখন গল্পের সবচেয়ে নাটকীয় দিকগুলো নিয়ে নিজেরা আলাপ করতে শুরু করে।

দেখা গেল জনতার মাঝে বণিক আজিজ নোমানের নামডাক আছে। তিনি কক্ষের মধ্যখানে গেলেন। সতর্কতা ও শ্রদ্ধার সাথে বললেন, “হে আরব ভাইয়েরা, আজকে আমাদের সাথে আছেন বিখ্যাত বেরেমিজ সামির। ইরানি গণিতজ্ঞ। উজির মালুফে সচিব।“

শত শত চোখ বেরেমিজের দিকে ঘুরে গেল। তার উপস্থিতিকে মানুষ নিজদের জন্যে সম্মানের চোখে দেখল।

গল্পকথক গণনাকারীকে শ্রদ্ধা জানালেন। পরিষ্কার ও পরিমিত কণ্ঠে বললেন, “বন্ধুগণ, আমি তো রাজা ও জ্বিনের অনেক দারুণ দারুণ গল্প বললাম। কিছু ভাল, কিছু মন্দ। এই মেধাবী গণনাকারীর সম্মানে আজ আমি একটি গল্প বলব। গল্পে একটি সমস্যার কথা আছে। আজ পর্যন্ত এর কোনো সমাধান নেই।

“দারুণ ব্যাপার! দারুণ” শ্রোতারা উত্তেজনায় চিৎকার করে উঠল।

সমস্ত প্রশংসার মালিক আল্লাহর নাম নিয়ে শেখ গল্প শুরু করলেন।

“একদা দামেশকে এক উদ্যমী চাষী বাস করতেন। তার ছিল তিনটি মেয়ে। একদিন চাষী কাজীকে বললেন, তার মেয়েরা খুবই বুদ্ধিমতী। পেয়েছে দুর্লভ কল্পনাশক্তিও। কাজী ছিলেন হিংসুটে ও সংকীর্ণমনা মানুষ। চাষীর মেয়েদের প্রতিভার কথা তার ভাল লাগল না। তিনি বললেন, ‘এই নিয়ে পাঁচবার তুমি আমাকে তোমার মেয়েদের জ্ঞান নিয়ে বাড়িয়ে বাড়িয়ে বললে। আমি তাদেরকে আমার দপ্তরে ডাকব। নিজেই দেখব তুমি যেমন বলছ আসলেই তারা তেমন চালাক কি না।‘

“কাজী তিন মেয়েকে ডেকে আনল। বললেন, ‘এই ৯০টি আপেল বাজারে বিক্রয় করতে হবে। সবার বড় ফাতিমা। ও নেবে ৫০টি আপেল। ফাহিমা নেবে ৩০টি। আর সবার ছোট খালিদা নেবে ১০টি আপেল। ফাতিমা ৭টি আপেল এক দিনারে বিক্রয় করলে তোমরাও তাই করবে। আর ফাতিমা প্রতিটি আপেল ৩ দিনারে বিক্রয় করলেও একই কথা। তোমরাও একই কাজ করবে। কিন্তু তোমাদের কাছে আপেল কম-বেশি থাকলেও সেগুলো বিক্রয় করে সমান অর্থ আয় করতে হবে।‘

‘কিন্তু আমি আমার আপেল কাউকে দেব না।‘ ফাতিমা বলল।

‘কোনো অবস্থাতেই না।‘ বলল দুষ্ট কাজী। ‘শর্তগুলো হলো: ফাতিমাকে ৫০টি আপেল বিক্রি করতে হবে। ফাহিমাকে বিক্রি করতে হবে ৩০টি আপেল। আর খালিদাকেও বাকি ১০টি আপেল বিক্রি করতে হবে। তোমাদের সবাইকে সমান দামে আপেল বিক্রি করতে হবে। আর শেষ পর্যন্ত সবাইকে সমান লাভ পেতে হবে।‘

“তিন বোন তো অদ্ভুত এক সঙ্কটে পড়ল। কীভাবে হবে এর সমাধান? সবাইকে সমান দামে আপেল বিক্রি করতে হলে তো ৫০টি আপেলের লাভ ৩০টি বা ১০টির চেয়ে অনেক বেশি হবে।

“তারা বুঝলা না কীভাবে সমস্যাটির সমাধান করবে। তাই তারা তাদের এলাকার এক ধর্মগুরু কাছে গেল। অনেকগুলো পৃষ্ঠাজুড়ে হিসাব-নিকাশ করলেন তিনি। এরপর বললেন:

“ ‘শোনো মেয়েরা, সমাধান তো খুব সহজ। কাজী যেভাবে বলেছেন সেভাবেই ৯০টি আপেল বেচে দাও। সবাই সমান লাভ পাবে।

“ধর্মগুরু মেয়েদেরকে কৌশল শিখিয়ে দিলেন। দেখে মনে হলো, এতে কোনো সমাধান নেই। তবু তারা বাজারে গিয়ে সে কৌশল অনুসারেই আপেলগুলো বিক্রি করল। একই দামে ফাতিমা ৫০টি, ফাহিমা ৩০টি আর খালিদা ১০টি আপেল বিক্রি করল। আর প্রত্যেকেই পেল সমান লাভ। গল্প এখানেই শেষ। ধর্মগুরু কীভাবে সমস্যাটি সমধানা করেছিলেন তা বলার দায়িত্ব আমাদের গণনাকারীকে দিলাম।“

গল্পকথকের শেষ হতেই বেরেমিজ শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে কথা শুরু করলেন।

“গল্পে গল্পে সমস্যার বর্ণনা দেওয়া দারুণ মজার একটি কাজ। গল্প খুব চমৎকারভাবে গাণিতিক যুক্তিকে আড়াল করে রাখে। কাজী যে সমস্যা দিয়ে তিন বোনকে বিপদে ফেলেছিল তার সমধান এ রকম:

“ফাতিমা এক দিনারে ৭টি করে আপেল বিক্রি করা শুরু করবে। এভাবে ৪৯টি আপেল বিক্রি করে একটি রেখে দেবে।“

“ফাহিমা একই দামে ২৮টি আপেল বিক্রি করে ২টি রেখে দেবে।

“খালিদাও একই দামে আপেল বিক্রি করবে। ১০টি থেকে ৭টি বিক্রি করে ৩টি রেখে দেবে।

“এরপর ফাতিমা বাকি একটি আপেল ৩ দিনারে বিক্রি করবে। কাজীর বলে দেওয়া নিয়ম অনুসারে ফাহিমা বাকি দুইটি আপেল ৩ দিনার করে বিক্রি করবে। খালিদাও বাকি তিনটি আপেল প্রতিটি ৩ দিনারে বিক্রি করবে।

তাহলে দুই ধাপে বিক্রয়কৃত আপেলের দাম ও লাভ হবে এমন:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **প্রথম ধাপে লাভ** | **দ্বিতীয় ধাপে লাভ** | **মোট** |
| ফাতিমা | ৪৯টি আপেল থেকে ৭ দিনার | ১টি আপেল থেকে ৩ দিনার | ১০ দিনার |
| ফাহিমা | ২৮টি আপেল থেকে ৪ দিনার | ২টি আপেল থেকে ৬ দিনার | ১০ দিনার |
| খালিদা | ৭টি আপেল থেকে ১ দিনার | ৩টি আপেল থেকে ৯ দিনার | ১০ দিনার |

“অতএব প্রত্যেকেই ১০ দিনার লাভ করেছে। আর এভাবেই কাজীর সমস্যার সমাধান হয়েছিল।“

আল্লাহ দুষ্ট লোকদের শাস্তি ও ভাল মানুষদের পুরস্কার দিন।

শেখ আল-মেদাহ বেরেমিজের সমাধানে অত্যন্ত খুশী হলেন। হাত উঁচিয়ে বললেন, “আল্লাহর কসম, ইনি সত্যিই একজন মেধাবী মানুষ। আমার দেখা অরথম মানুষ যিনি জটিল ব্যাখ্যা ছাড়াই কাজীর সমস্যাটি নিখুঁতভাবে সমাধান করে দিয়েছেন।

রেস্তোরাঁয় উপস্থিত সকলেই সমস্বরে বলে উঠল, “সাবাশ! সাবাশ! আল্লাহ এই বিজ্ঞ লোকটির মেধা আরও বাড়িয়ে দিন।“

গোলমাল থামিয়ে বেরেমিজ বললেন, “বন্ধুগণ, আমাকে বলতে হচ্ছে বিজ্ঞ খেতাব পাওয়ার মতো যোগ্যতা আমার মধ্যে নেই। যে নিছক অজ্ঞতা দূর করে তাকে বিজ্ঞ বলা যায় না। আল্লাহ জ্ঞানের সাথে তুলনা করলে মানুষের জ্ঞানের কি কোনো মূল্য থাকে?”

কেউ কিছু বলার আগে বেরেমিজ একটি গল্প শুরু করলেন:

“একবার একটি পিঁপড়া পৃথিবীর বুকের ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। সামনে পড়ল একটি চিনির পাহাড়। দেখে পিঁপড়া দারুণ খুশী। সে পাহাড় থেকে একটি চিনির কণা নিয়ে বাসায় চলে গেল। ‘এটা কী?’ তার প্রতিবেশীর জিজ্ঞাসা। ‘এটা,’ পিঁপড়া জবাব দিল, ‘একটি চিনির পাহাড়। আমার চলার পথে বাসায় নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নেই।‘

বেরেমিজ সাধারণত খুব শান্ত থাকেন। তবে এখন একটু উত্তেজিত হলেন, “এটাই অহঙ্কারীদের জ্ঞানের নমুনা। একটি কণাকে হিমালয়ের সাথে তুলনা করা। বিজ্ঞান হলো বিশাল এক চিনির পাহাড়। এই পাহাড় থেকে তো আমরা সামান্যই গ্রহণ করতে পারি।“

এরপর দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, “মানুষের কাজে লাগার মতো একমাত্র বিজ্ঞান হলো আল্লাহর বিজ্ঞান।“

ইয়েমেনের একজন নাবিক জিজ্ঞেস করল, “আল্লাহর বিজ্ঞান আবার কী?”

“আল্লাহর বিজ্ঞান হলো দয়া ও উদারতা।“ বেরেমিজ জবাব দিলেন।

তখন আমার মনে পড়ল শেখ ইয়াজিদের বাগানে পাখিদেরকে মুক্ত করে দেওয়ার পর তেলাসসিমের গানের কথা:

আমার কণ্ঠ হয় যদি গায়কের মতো

অথবা ফেরেশতার

আর আমার মধ্যে যদি দয়া না থাকে

তাহলে আমার কণ্ঠ হবে

তামা বা পিতলের ঝন ঝনের মতো

আমি শূন্য

আমি শূন্য

মধ্য রাতে আমরা রেস্তোরাঁ থেকে বাসায় ফিরলাম। চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। যাওয়ার পথটাও বেশ গোলমেলে। অনেকগুলো মানুষ আমাদেরকে মশাল হাতে এগিয়ে দিতে চাইল। তাও একটু পরেই আমরা পথ হারিয়ে ফেললাম। আকাশের দিকে তাকালাম আমি। অন্ধকারে ফুঁড়ে সেখানে তারার কাফেলা ছুটছে। লুব্ধক নক্ষত্রকে দেখেই চিনে ফেললাম।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

১৮

একটি বিপজ্জনক মুক্তো



আমরা শেখ ইয়াজিদের প্রাসাদে ফিরে গেলাম। কবি ও পণ্ডিতদের মিলনমেলা। লাহোরের মহারাজার প্রতি শ্রদ্ধা। ভারতের গণিতের গল্প। লীলাবতীর মুক্তোর অপূর্ব রূপকথা। গণিত সম্পর্কে হিন্দুদের অসাধারণ গবেষণা-পুস্তক।

পরের দিন সকাল সকাল। আমাদের সাদাসিধে সরাইখানায় এক মিশরীয় এলেন। সাথে কবি ইয়াজিদের এক চিঠি।

“এখনও বেশি সকাল।“ বললেন বেরেমিজ। “আমার মনে হচ্ছে আমার ছাত্রী এখনও হয়ত পড়ার জন্যে প্রস্তুত নয়।“

মিশরীয় জানালেন, গণিত পড়ানোর আগে শেখ ইরানিকে কিছু বন্ধুর সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে চান। এ কারণে যতটা সম্ভব আগে আগে গেলেই সুবিধা হত।

এবার পথের নিরাপত্তার জন্যে আমরা সাথে তিনজন শক্তসামর্থ্য কৃষ্ণাঙ্গ দাস নিলাম। দুর্ধর্ষ ও ঈর্ষাপরায়রণ তারা তির হয়ত পথে আমাদের ওপর হামলা ক্রে বসতে পারে। তার প্রতিপক্ষ বেরেমিজকে হত্যা করতে চাইতে পারে।

অপ্রীতিকর কিছু ঘটল না। এক ঘণ্টা পরেই আমরা শেখ ইয়াজিদের সুরম্য প্রাসাদে পৌঁছে গেলাম। মিশরীয় ভৃত্য আমাদেরকে সুদীর্ঘ এক গ্যালারি পার করে সুন্দর অভ্যর্থনা কক্ষে নিয়ে এল। কক্ষের নীল দেয়ালে সোনালী কারুকার্য। আমরা নীরবে তাকে অনুসরণ করলাম। অবশ্য আমাদের হঠাৎ আসা নিয়ে মাঝেমধ্যে কিছু কথা বলছিলাম আমি।

কক্ষে তেলাসসিমের বাবাকে দেখলাম। সাথে কয়েকজন কবি ও বিজ্ঞ মানুষ বসা।

“আসসালামু আলায়কুম।“

আমরা অভিবাদন বিনি অয় করলাম। গৃহকর্তা আমাদের উষ্ণভাবে স্বাগতম জানালেন। নরম রেশমী আসনে বসলাম আমরা। একজন কৃষ্ণাঙ্গ দাস ফলমূল, রুটি ও গোলাপজল নিয়ে এল।

দেখলাম অতিথিদের মধ্যে একজন বিদেশি আছেন। জামাকাপড় অত্যন্ত দামী। সাদা রেশমী কাপড়ের জোব্বা। তার ওপরে রত্নখচিত বড় ফিতা জড়ানো। জামার সাথে একটি খঞ্জর লাগানো। খঞ্জরের খোপে নীলকান্ত মণি ও লেপিস লেজুলি পাথর গেঁথে দেওয়া। পাগড়িটা নীল রেশমী কাপড়ের তৈরি। কালো সুতা ও দামী পাথর দিয়ে সাজানো। কোমল আঙ্গুলে চমকাচ্ছে চিকন আংটি।

“মহান সংখ্যামানব,” শেখ ইয়াজিদ বেরেমিজকে বললেন, “আমার গরীবালয়ের অতিথিদেরকে দেখে নিশ্চয়ই অবাক হচ্ছেন। এ সভাটির আয়োজন করেছি আমাদের শ্রদ্ধেয় অতিথি রাজকুমার ক্লুজির উদ্দিন মুবারক শাহের সম্মানে। তিনি লাহোর ও দিল্লীর নৃপতি।

বেরেমিজ রত্নখচিত ফিতা পরা মহারাজাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন।

সরাইখানায় থাকতেই আমরা বিদেশীদের গল্প শুনেছি। রাজকুমার ভারতের প্রাসাদ ছেড়ে বাইরে এসেছেন মুসলমান হিসেবে মক্কায় হজ্ব পালনের উদ্দেশ্য নিয়ে। বাগদাদে কিছুদিন থেকে তিনি কয়েকদিনের মধ্যেই পবিত্র নগরীর দিকে রওয়ানা দেবেন। সাথে আছে অসংখ্য ভৃত্য ও সহকারী।

“রাজকুমার ক্লুজির শাহের, “শেখ ইয়াজিদ বললেন, “একটি প্রশ্ন আছে। আমরা চাই আপনি আমাদেরকে এ ব্যাপারে সাহায্য করুন। হিন্দুরা গণিতে কী অবদান রেখেছেন? আর হিন্দুদের মধ্যে কারা জ্যামিতিতে অসাধারণ কাজ করেছেন?”

“শ্রদ্ধেয় শেখ,” বেরেমিজ বললেন, “আমার ওপর যে দায়িত্ব অর্পণ করলেন তা পালন করতে পড়াশোনা ও স্থিরতার প্রয়োজন আছে। পড়াশোনা লাগবে বিজ্ঞানের ইতিহাস বিস্তারিত জানার জন্যে। আর স্থিরতা চাই সেটাকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করতে। তবে, শ্রদ্ধেয় শেখ, আপনার ন্যূনতম ইচ্ছাই আমার কাছে নির্দেশের মতো। রাজকুমার ক্লুজির শাহের সম্মানে আমি অতিথিদের সামনে গঙ্গার তীরের দেশের গণিতচর্চার ইতিহাস যতটা জানি তাই তুলে ধরব।“

তিনি শুরু করলেন, “মুহাম্মাদের (সা) নয় কি দশ শতক আগে ভারতে অপস্তম্ব নামে একজন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ ছিলেন। এই পণ্ডিত শুল্বসূত্র নামে একটি সংকলন লেখেন। পুরোহিতরা কীভাবে মন্দির ও বেদি বানাবেন এতে সে সম্পর্কে নির্দেশনা ছিল। শুল্বসুত্র পিথাগোরাসের তত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত কম। হিন্দু পণ্ডিতরা গ্রিক গবেষণার পদ্ধতির অনুসারী ছিলেন না। শুল্বসুত্রে নির্মাণ কাঠামো বিষয়ক অনেকগুলো উপপাদ্য ও সূত্র আছে। বেদি নির্মাণকৌশল দেখাতে অপস্তম্ব একটি সমকোণী ত্রিভুজ আঁকার প্রস্তাব দেন। ত্রিভুজটির বাহুগুলো হবে যথাক্রমে ৩৯, ৩৬ ও ১৫ ইঞ্চি। এই সমস্যার সমাধানের জন্যে যে নীতিমালা কাজে লাগান তাকে সবাই পিথাগোরাসের অবদান মনে করে:

অতিভূজের ওপর অঙ্কিত বর্গের ক্ষেত্রফল অন্য দুই বাহুর ওপর অঙ্কিত বর্গের ক্ষেত্রফলের যোগফলের সমান।“

শেখ ইয়াজিদ খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন। তার দিকে ফিরে বেরেমিজ বললেন, বিখ্যাত এই প্রস্তাবনাটা চিত্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা সহজ। শেখ ইয়াজিদ ভৃত্যকে নির্দেশ দিতেই দুজন দাস বড় একটি বক্স নিয়ে এল। এগুলোর ওপরে বেরেমিজ সহজেই লাহোরের রাজপুত্রের জন্যে চিত্র আঁকতে ও হিসাব-নিকাশ করতে পারবেন। বাঁশের কঞ্চি দিয়ে বেরেমিজ চিত্র আঁকলেন।

“এই হলো সমকোণী ত্রিভুজ। এর সবচেয়ে লম্বা বাহুকে বলে অতিভুজ। এবার তিন বাহুরই ওপরে বর্গ আঁকি। এতে করে বোঝা যাবে অতিভুজের ওপর আঁকা বড় বর্গটির ক্ষেত্রফল অপর দুই বর্গের ক্ষেত্রফলের যোগফলের সমান। এভাবে পিথাগোরাসের সূত্র প্রমাণিত হবে।

রাজপুত্র জানতে চাইলেন, এই কথা কি সব ত্রিভুজের জন্য সত্য কি না। বেরেমিজ ভরাট কণ্ঠে বললেন, “এটা সব সমকোণী ত্রিভুজের জন্য সত্য। আমি নিশ্চিন্তে বলতে পারি, পিথাগোরাসের সূত্র একটি চিরন্তন সত্য। সূর্য যখন আলো বিকানো শুরু করতে পারেনি, যখন নিঃশ্বাস নেওয়ার মতো বাতাস তৈরি হয়নি, তখনও অতিভুজের বর্গ অপর দুই বাহুর বর্গের সমষ্টির সমান ছিল।

রাজপুত্র বেরেমিজের ব্যাখ্যায় মুগ্ধ হলেন। আবেগময় কণ্ঠে ইয়াজিদকে বললেন, “বন্ধু! জ্যামিতি কতই না বিস্ময়কর! কত অসাধারণ এক বিজ্ঞান! এখান থেকে আমরা দুটি জিনিস জানলাম। স্পষ্টতা ও সারল্য। সবচেয়ে হীন ও চিন্তাশূন্য হৃদয়কে যা আলোড়িতে করে যায়।“

বেরেমিজের বাহুতে মৃদুভাবে হাত রেখে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, “এই গ্রিক তত্ত্বটা কি অপস্তম্বের শুল্বসূত্রে আছে?”

“হ্যাঁ, জনাব।“ বেরেমিজ জবাব দিলেন। “শুল্বসূত্রে পিথাগোরাসের সূত্রটা একটু ভিন্নভাবে লেখা আছে। অপস্তম্বের লেখা পড়েই পুরোহিতরা মন্দির বানানো শিখেছিল। সমকোণকে থেকে তৈরি করেছিল তার সমতুল্য বর্গ।“

“ভারতে আরও উল্লেখযোগ্য গাণিতিক আবিষ্কার হয়েছিল?”

“বেশ অনেকগুলো।“ বেরেমিজ জবাব দিলেন। *সুনা সিদৌতা*র কথা বলতে পারি। উল্লেখযোগ্য এই সংকলনের লেখকের নাম কেউ জানে না। দশমিকের নিয়মগুলো এতে দারুণভাবে দেখানো হয়েছে। শূন্যের গুরুত্বও এতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আর্যভট্ট ও ব্রহ্মগুপ্ত তো আজকের দুনিয়ায় খুব প্রশংসিত দুজন ব্রাহ্মণ। এই দুই পণ্ডিতের কাজও ছিল অনেক গুরুত্বপূর্ণ। আর্যভট্টের লেখাগুলো চারভাগে বিভক্ত। মহাকাশের ঐকতান, সময় ও পরিমাপ, গোলক এবং হিসাব-নিকাশের ভিত্তি। মাঝেমধ্যেই তিনি ভুলও বলেছেন অবশ্য। যেমন তিনি বলেছেন, পিরামিডের ভূমির অর্ধেককে উচ্চতা দিয়ে গুণ করলে আয়তন পাওয়া যায়।“

“সেটা কি সত্য নয়?” রাজপুত্রের জিজ্ঞাসা।

“না, একদম ভুল।“ বেরেমিজ বললেন, “পিরামিডের আয়তন পেতে হলে ভূমির অর্ধেক নয়, তিন ভাগের এক ভাগ দিয়ে উচ্চতাকে গুণ করতে হয়।“

রাজপুত্রের পাশেই একজন হালকা গড়নের লম্বা মানুষ বসেছিলেন। পোশাক অভিজাত। দাঁড়ি লাল ও ধূসর। দেখে হিন্দু মনে হয় না। আমি ভাবলাম, ইনি সম্ভবত বাঘশিকারী। তবে আমার ভাবনা ভুল। তিনি একজন হিন্দু জ্যোতিষী। রাজপুত্রের সঙ্গে তিনিও মক্কা যাচ্ছেন। মাথায় নীল পাগড়ি। তাতে চমৎকারভাবে তিনটা প্যাঁচ দেওয়া। নাম সাধু গং। বেরেমিজের আলোচনা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছেন।

এক পর্যায়ে জ্যোতিষী সাধু গংও আলোচনায় অংশ নিলেন। কথায় অদ্ভুত বিদেশী টান। বললেন, “ভারতের এক পণ্ডিত ব্যক্তি জ্যামিতি নিয়ে গবেষণা করতেন, নক্ষত্রের রহস্য এবং আকাশের গভীরতম গুপ্ত কথা জানতেন—এটা কি সত্য?”

বেরেমিজ এক মুহূর্ত ভাবলেন। তারপর বক্সের ওপরটা মুছে বাঁশের কঞ্চি দিয়ে একটি নাম লিখলেন:

*বিজ্ঞ ভাস্কর*

শ্রদ্ধার সঙ্গে বললেন, “ভারতের সবচেয়ে বিখ্যাত জ্যামিতিকের নাম এটি। ভাস্কর নক্ষত্রের রহস্য জানতেন। মহাবিশ্বের গভীরতম রহস্যগুলো নিয়ে গবেষণা করতেন। ডেকান প্রদেশের বিদমে জন্ম। এটা মুহাম্মাদের (সা) জন্মের পাঁচ শতাব্দী পরের কথা। তাঁর প্রথম গ্রন্থের নাম *বীজগণিত*।“

“বীজগণিত?” জিজ্ঞেস করলেন নীল পাগড়িওয়ালা। “বীজ মানে তো বীজ আর আমাদের প্রাচীন এক আঞ্চিল্ক ভাষায় গণিত মানে হলো গণনা বা পরিমাপ করা।“

“হ্যাঁ, এটাই।“ বেরেমিজ বললেন। বীজগণিতের শাব্দিক অর্থ করলে হয় ‘বীজ গণনার শিল্প’। বীজগণিত ছাড়াও ভাস্করের *লীলাবতী* নামে আরও একটি বিখ্যাত কাজ আছে। আমরা জানি লীলাবতী ছিল তাঁর মেয়ের নাম।

নীল পাগড়ির পরা জ্যোতিষী আবার কথা বললেন, “কথিত আছে লীলাবতীকে নিয়ে একটি গল্প প্রচলিত আছে। আপনার কি সেটা জানা আছে?”

“হ্যাঁ, জানা আছে।“ বেরেমিজ জবাব দিলেন। “আমাদের রাজপুত্র চাইলে আমি গল্পটা বলতে পারি।“

“অবশ্যই শুনতে চাই।“ লাহোরের রাজপুত্র আন্তরিকভাবে বলে উঠলেন। “লীলাবতীর গল্পটা হয়ে যাক তাহলে। আমি নিশ্চিত সবাই মুগ্ধ হবে শুনে।“

এ সময় শেখ ইয়াজিদের ইঙ্গিত পেয়ে পাঁচ-ছয় জন দাস কক্ষে এল। টেবিলে রাখল পুর দেওয়া পাখির মাংস, দুধের কেক, ফল ও হালকা কিছু খাবার। সুস্বাদু খাবার শেষ করে আমরা অযু করলাম। গণনাকারী গল্প পুনরায় শুরু করতে বলা হলো।

বেরেমিজ মাথা তুলল। উপস্থিত সবার দিকে তাকিয়ে কথা শুরু করলেন।

“বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। বিখ্যাত জ্যামিতিক বিজ্ঞ ভাস্করের লীলাবতী নামে এক মেয়ে ছিল। জন্মের পরে জ্যোতিষীরা নক্ষত্রদের অবস্থান দেখে বলল, মেয়েটি আজীবন কুমারী থাকবে। তার সাথে সুদর্শন যুবক ছেলেদের ভালোবাসা সফল হবে না। ভাস্কর নিয়তির এমন পরিণতি মানতে পারলেন না। সে যুগের সবচেয়ে বিখ্যাত জ্যোতিষীর সাথে কথা বললেন।

“এক জ্যোতিষী মেয়েক সমুদ্রের কাছে দ্রাবিড় প্রদেশে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন। সেখানে ছিল পাথরের খোদাই করা একটি মন্দির। তাতে ছিল বুদ্ধের একটি প্রতিকৃতি। হাতে একটি নক্ষত্র। জ্যোতিষী কসম খেয়ে বলল শুধু দ্রাবিড়েই লীলাবতী স্বামী খুঁজে পাবে। তবে সুখী বিয়ের জন্যে শর্ত হলো সিলিন্ডার ঘড়ির একটি নির্দিষ্ট সময়েই বিয়ের অনুষ্ঠান করতে হবে।

“লীলাবতী আনন্দ ও বিস্ময়ের সাথে দেখল, তার বিয়ের প্রস্তাব এসেছে ধনী, সৎ, পরিশ্রমী ও উঁচু বংশের এক যুবকের কাছ থেকে। দিনক্ষণ ঠিক হলো। বন্ধুরা আসল অনুষ্ঠানে যোগ দিতে।

“হিন্দুরা দিনের ঘণ্টার হিসাব রাখত পানির পাত্রে সিলিন্ডার ডুবিয়ে। সিলিন্ডারের উপরের মুখ খোলা। তলার কেন্দ্রে ছিল একটি ছোট ছিদ্র। ছিদ্র দিয়ে পানি প্রবেশ করতে করতে সিলিন্ডার পূর্ণ হয়ে গেলে একটি নির্দিষ্ট সময়ে সেটি পানির পাত্রে ডুবে যেত।

“ভাস্কর খুব যত্নের সাথে সিলিন্ডার ঘড়ির সময়ের হিসাব রাখলেন। পানির দাগ নির্দিষ্ট অবস্থানে আসার জন্যে অপেক্ষা। অন্য মেয়েদের মতো লীলাবতীও কৌতূহলী। সিলিন্ডার ঘড়িতে পানির স্তর দেখার জন্যে সে একটু ঝুঁকল। পোশাকের একটি মুক্তো তাতে ঢিলা হয়ে গেল। পড়ল পানিতে। দূর্ভাগ্যক্রমে মুক্তোর দানা পানির ছিদ্রটি বন্ধ করে দিল। বর ও অতিথিরা নক্ষত্র দেখল। অনুষ্ঠানের জন্যে আরেকটি দিন ঠিক করল। কিছুদিন পর লীলাবতীর বাগদত্তা যুবক হারিয়ে গেল। ভাস্করের মেয়ে আজীবন কুমারীই থাকল।

ভাস্কর বুঝলেন, নিয়তির সাথে লড়ে লাভ নেই। মেয়েকে বললেন, ‘আমি একটি বই লিখব, যা তোমার নামটি চিরকাল টিকিয়ে রাখবে। তোমার অভিশাপগ্রস্থ বিয়ে থেকে যে সন্তানরা জন্ম নিতে পারত তাদের জীবনের চেয়ে দীর্ঘ সময় তুমি মানুষের স্মৃতিতে বেঁচে থাকবে।‘

“ভাস্করের বই বিখ্যাত হয়ে গেল। গণিতের ইতিহাসে লীলাবতীর নামও স্থায়ীভাবে লেখা হয়ে গেল। লীলাবতী হলো দশমিক ও পূর্ণ সংখ্যার হিসাব-নিকাশের একটি পদ্ধতিগত প্রায়োগিক বই। চারটি বিশেষ গাণিতিক হিসাব নিয়ে এটি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ চালিয়েছে। এগুলো হলো উচ্চতার সমস্যা, বর্গ, ঘন ও বর্গমূল সমাধান করা। এতে আলোচনা করা হয়েছে যেকোনো সংখ্যার ঘনমূল বের করার উপায়ও। এরপর এতে ভগ্নাংশের আলোচনা করা হয়েছে। যেখানে ভগ্নাংশকে সমহর বিশিষ্ট সংখ্যা বানানোর উপায় দেখানো হয়েছে, যা বর্তমানে খুব পরিচিত পদ্ধতি। এসব সমস্যার ব্যাখ্যা ভাস্কর খুব রুচিশীল ও রোমাঞ্চকর উপায়ে লিখেছেন। তাঁর বইয়ের একটি কথা এ রকম:

হরিণের চেয়ে কোমল চোখের অধিকারিণী, সবার অতি প্রিয় লীলাবতী, আমাকে বলো ১৩৫কে ১২ দিয়ে গুণ করলে কত হয়?

“বইয়ের আরেকটি মজার সমস্যায় এক ঝাঁক মৌমাছির বিষয়ক একটা হিসাবের কথা আছে:

এক ঝাঁক মৌমাছির এক পঞ্চমাংশ কদম ফুলের ওপর এসে বসল। তিন ভাগের একভাগ বসল সিলিন্দা ফুলের ওপর। এই মৌমাচ্ছির সংখ্যার বিয়োগফলের সমান মৌমাচ্ছি ক্রুতজা ফুলের ওপর দিয়ে উড়ে গেল। চামেলি ও গাঁদা ফুলের সৌরভে একটি মৌমাছি একা বাতাসে উড়ে বেড়াচ্ছে। বলো সুন্দরী মেয়ে, ঝাঁকে কয়টি মৌমাছি ছিল।

এর উত্তর ১৫। ভাস্কর তাঁর বইয়ে দেখিয়েছেন, সবচেয়ে জটিল সমস্যাগুলোকেও সুন্দর ও রুচিশীল উপায়ে উপস্থাপন করা যায়।

বালুর মধ্যে এঁকে এঁকে বেরেমিজ লাহোরের রাজপুত্রকে লীলাবতী থেকে আরও অনেকগুলো অদ্ভুত সমস্যা দেখালেন।

বেচারী লীলাবতী!

দূর্ভাগাটা মেয়েটির কথা ভেবে আমার কবির কবিতার লাইন মনে পড়ে গেল:

মহাসমুদ্র যেভাবে পৃথিবীকে ঢেকে রেখেছে

মেয়ে, তুমিও তেমনি

ঢেকে দাও পৃথিবীর হৃদয়কে

তোমার চোখের অশ্রুজলে

১৯

নাবিকের পছন্দ



রাজপুত্র ক্লুজির শাহ গণনাকারীর প্রশংসা করলেন। বেরেমিজ তিন নাবিকের সমস্যার সমাধান করলেন। আবিষ্কার করলেন মেডালিয়নের রহস্য। লাহোরের মহারাজার বদান্যতা।

হিন্দুস্তানের বিজ্ঞানচর্চা ও গণিতের ইতিহাসে তার অবস্থানকে বেরেমিজ প্রশংসা করায় ক্লুজির শাহ অত্যন্ত খুশী হলেন। তরুণ রাষ্টনায়ক বললেন, তাঁর মতে গণনাকারী অনেক জ্ঞানী একজন মানুষ। যিনি ভাস্করের বীজগণিত ১০০ ব্রাহ্মণকে শেখাতে পারবেন।

“বেচারী লীলাবতির গল্পটা মুগ্ধ হয়ে শুনলাম। মেয়েটা জামার মুক্তো হারিয়ে বরকেও হারাল।” রাজপুত্র বললেন। “ভাস্করের সমস্যাগুলো গণনাকারী খুব আকর্ষণীয়ভাবে বলে শোনালেন। সমস্যাগুলোতে আছে কাব্যিক ভাবও, যা সাধারণত গাণিতিক লেখনীতে দেখা যায় না। তবে খারাপ লাগছে এজন্যে যে বিজ্ঞ গণনাকারী তিন নাবিকের বিখ্যাত সমস্যাটি উল্লেখ বললেন না। অনেকগুলো বইয়ে এটা আছে। এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি কোনো সমাধান।“

“মহানুভব প্রিন্স,” বেরেমিজ বললেন, “আমি এটা উল্লেখ করিনি কারণ আমি নিজেই এটা ভাল করে জানি না।“

“আমি এটা ভাল করে জানি।“ প্রিন্স বললেন। “এটা সবাইকে শোনাতে আমার খুব ভাল লাগবে। এই গাণিতিক সমস্যাটিতে বীজগণিতের অনেক কিছু আছে।“

এরপর প্রিন্স ক্লুজির শাহ গল্পটা শোনালেন:

“সিরিন্দিব থেকে মসলার কার্গো নিয়ে একটি জাহাজ ফিরছিল। জাহাজটি হঠাৎ মারাত্মক ঝড়ের কবলে পড়ল। তিনজন নাবিক অসীম সাহসিকতার পরিচয় না দিলে জাহাজটি আগ্রাসী ঢেউয়ের কবলে পড়ে ধ্বংসই হয়ে যেত। নাবিকরা ঝড়ের মধ্যে অসাধারণ দক্ষতায় পাল নিয়ন্ত্রণ করেন।

“জাহাজের কাপ্তান সাহসী নাবিকদের পুরস্কৃত করতে চাইলেন। সেই হিসেবে তাদেরকে অনেকগুলো মুদ্রা দিলেন। মুদ্রার সংখ্যা ২০০ থেকে ৩০০-এর মধ্যে। মুদ্রাগুলোকে একটি সিন্ধুকের মধ্যে রাখা হলো। কাপ্তানের ইচ্ছে, পরের দিন জাহাজ তীরে ভিড়লে কর সংগ্রাহক মুদ্রাগুলো তিন নাবিকের মধ্যে ভাগ করেন।

“রাতে এক নাবিকের ঘুম ভাঙলে সে ভাবল, ‘আমার অংশটা আমি এখনি নিয়ে নিলেই ভাল হয়। এতে করে আমার আমার অংশ নিয়ে আমার দুই বন্ধুর আমাকে তর্ক করতে হবে না।‘ বাকি দুজনকে কিছু না বলে সে সিন্ধুকের কাছে চলে এল। মুদ্রাগুলো নিয়ে তিনভাগ করল। কিন্তু সমান তিনভাগ হলো না। একটি মুদ্রা বেশি। ‘এই অভিশপ্ত মুদ্রাটির কারণে,’ সে ভাবল, ‘আমাদের মধ্যে আগামীকাল তর্ক লাগবেই। এর চেয়ে এটাকে ফেলে দেই।‘ এটাকে পানিতে ফেলে দিয়ে সে চুপিচুপি বিছানায় ফিরে এল।

“সে পুরস্কারের নিজের অংশটা নিয়ে বাকি দুজনের ভাগ সিন্ধুকে রেখে আসল।“

“এক ঘণ্টা পরের কথা। আরেকজন নাবিকের মাথায় একই ভাবনা আসল। সেও গেল সিন্ধুকের কাছে। সে তো আর জানে না, আরেকজন নাবিক তার অংশ আগেই নিয়ে গেছে। সেও মুদ্রাগুলোকে তিন ভাগ করল। আবারও একটি কয়েন বাকি থাকল। পরের দিন ঝগড়া এড়াতে সেও বাড়তি মুদ্রাটি পানিতে ফেলে দিল। তারপর সে বিছানায় ফিরে এল। ভাবল নিজের সঠিক ভাগটাই নিয়ে এসেছে।

“তৃতীয় নাবিকে মনেও একই ভাবনা। সে জানলও না দুইজন একই কাজ করেই ফেলেছে ইতোমধ্যে। সে খুব ভোরে ভোরে ঘুম থেকে উঠল। সিন্ধুকের মুদ্রা বের করে তিন ভাগ করল। আবারও একটি কয়েন বাকি থাকল। সেও সেটা পানিতে ফেলল। নিজের অংশ নিয়ে সেও ফিরে গেল বিছানায়।

“পরের দিন সকালে জাহাজ তীরে পৌঁছল। কর সংগ্রাহক এসে দেখল সিন্ধুকে কিছু মুদ্রা পড়ে আছে। তিনি সেগুলোকে তিন ভাগ করলেন। তিনজন নাবিকের প্রত্যেককে এক ভাগ করে দিলেন। আবারও নিঃশেষে ভাগ হলো না। বাকি থাকল একটি মুদ্রা। এটা তিনি মজুরি হিসেবে নিজের কাছে রেখে দিলেন। কোনো নাবিকই আপত্তি করল না। প্রত্যেকেরই বিশ্বাস, সে নিজের ভাগ আগেই পেয়েছে।

“এখন সমস্যাটি হলো: শুরুতে সিন্ধুকে কয়টি মুদ্রা ছিল? আর প্রত্যেক নাবিক কতটি করে মুদ্রা পেয়েছে?”

গণনাকারী খেয়াল করলেন, গল্পটি শুনে উপস্থিত সবার চোখেমুখে কৌতূহল কাজ করছে। ভাবলে তাঁকেই এর পূর্ণ ব্যাখ্যা দিতে হবে। বের করতে হবে সমাধান।

এরপর বললেন:

“আপনি বললেন, মুদ্রার সংখ্যা ছিল ২০০ থেকে ৩০০। প্রথম নাবিক ভাগ করার আগে মুদ্রা ছিল ২৪১টি।

“প্রথম নাবিক সেগুলোকে তিন ভাগ করল। একটি ফেলে দিল সাগরে। তাহলে:

২৪১ ÷ ৩ = ৮০ ও ভাগশেষ ১

“সে এখান থেকে এক ভাগ নিয়ে গেল। সিন্ধুকে বাকী থাকল:

২৪১ – (৮০ + ১) = ১৬০টি মুদ্রা

“দ্বিতীয় নাবিক সেগুলোকে তিন ভাগ করে একটি পানিতে ফেলল।

১৬০ ÷ ৩ = ৫৩ ও ভাগশেষ ১

“এর এক ভাগ পকেটে পুরে সে বিছানায় ফিরে গেল। সিন্দুকে বাকি থাকল:

১৬০ – (৫৩ + ১) = ১০৬টি মুদ্রা

“এরপর তৃতীয় নাবিক ১০৬টি মুদ্রাকে তিন ভাগে ভাগ করল। ভাগশেষ হিসেবে পাওয়া একটি মুদ্রাকে ফেলে দিল পানিতে:

১০৬ ÷ ৩ = ৩৫ ও ভাগশেষ ১

“সে বিছানায় ফিরে গেল। আর সিন্ধুকে মুদ্রা থাকল

১০৬ – (৩৫ + ১) = ৭০টি

“জাহাজ তীরে ভেড়ার সময় এ মুদ্রাগুলোই সিন্ধুকে অবশিষ্ট ছিল। কাপ্তানের কথামতো কর সংগ্রাহক মুদ্রাগুলোকে তিনভাগ করল। তাও ভাগশেষ ১ থাকল।

৭০ ÷ ৩ = ২৩ ও ভাগশেষ ১

“তিনি তিন নাবিককেই ২৩টি করে মুদ্রা দিলেন। বাকি ১টা মজুরি হিসেবে রাখলেন নিজের কাছে। তাহলে ২৪১টি মুদ্রার বণ্টন যেভাবে হলো:

|  |  |
| --- | --- |
| মুদ্রার গন্তব্য | **সংখ্যা** |
| প্রথম নাবিক | ৮০ + ২৩ = ১০৩টি মুদ্রা |
| দ্বিতীয় নাবিক | ৫৩ + ২৩ = ৭৬টি |
| তৃতীয় নাবিক | ৩৫ + ২৩ = ৫৮টি |
| কর সংগ্রাক | ১টি মুদ্রা |
| সমুদ্রের পানিতে | ৩টি মুদ্রা |
| মোট | **২৪১টি মুদ্রা** |

সমস্যাটি সমাধান করে বেরেমিজ নীরব হয়ে গেলেন। লাহোরের প্রিন্স পকেট থেকে একটি রূপার মেডালিয়ন বের করলেন। গণনাকারীর দিকে ফিরে বললেন, “তিন নাবিকের সমস্যাকে অনেক সরল করে সমাধান করে দেখিয়েছেন আপনি। আমার তো মনে হয় আরও জটিল গাণিতিক সমস্যাও আপনি সহজেই ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

“এই মেডালিওয়নের খণ্ডটাতে,” প্রিন্স বলতে থাকলেন, “খোদাইয়ের কাজ করেছে একজন ধর্মীয় শিল্পী। তিনি আমার বাবার দরবারে কিছুদিন কাজ করেছেন। এতে খোদাইশিল্পী একটি ধাঁধাঁ লিখেছেন। এখন পর্যন্ত কোনো জাদুকর বা জ্যোতিষী এর সমাধান দিতে পারেনি। মেডালিয়নের এক পাশে ১২৮ লেখা। সংখ্যাটিকে ঘিরে রেখেছে ৭টি চুনিপাথর। অন্য পাশটি চার অংশে বিভক্ত। তাতে চারটি সংখ্যা লেখা।

৭, ২১, ২ ও ৯৮

“দেখতেই পাচ্ছেন চারটি সংখ্যার যোগফল ১২৮। কিন্তু ১২৮কে চার ভাগে ভাগ করার কী অর্থ?”

বেরেমিজ প্রিন্সের হাত থেকে মেডালিয়নটা নিলেন। কিছুক্ষণ নীরবে ভাবলেন। তারপর বললেন:

“সম্মানিত প্রিন্স, এই মেডালিয়নের খোদাইকারী গণিতের ধ্যান-জ্ঞানে নিবিষ্ট ছিলেন। প্রাচীনকালের মানুষ মনে করত কিছু কিছু সংখ্যার জাদুকরী ক্ষমতা আছে। ৩কে স্বর্গীয় সংখ্যা মনে করা হত। ৭ পবিত্র সংখ্যা। ১২৮-এর চারপাশের ৭টি চুনি বলছে খোদাইকারী ৭ ও ১২৮-এর সম্পর্ক নিয়ে মগ্ন ছিলেন। আমরা জানি ১২৮কে সাতটি ২-এর গুণফল আকারে প্রকাশ করা যায়:

২ × ২ × ২ × ২ × ২ × ২ × ২

“১২৮কে আবার চার ভাগেও ভাগ করা যায়:

৭, ২১, ২ ও ৯৮

এ থেকে আমরা যা বুঝি তা হলো: প্রথম সংখ্যার সাথে ৭ যোগ করুন, দ্বিতীয়টি থেকে ৭ বিয়োগ করুন, তৃতীয়টিকে ৭ দিয়ে গুণ করুন ও চতুর্থটিকে ৭ দিয়ে ভাগ করুন। সবগুলোর ফল একই হবে:

৭ + ৭ =১৪

২১ – ৭ = ১৪

২ × ৭ = ১৪

৯৮ ÷ ৭ = ১৪

“এই মেডালিয়ন হয়ত তাবিজ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল। কারণ এতে ৭-এর সম্পর্ক রয়েছে। আর ৭ ছিল পবিত্র সংখ্যা।“

বেরেমিজের ব্যাখ্যায় লাহোরের প্রিন্স আবারও যারপরনাই মুগ্ধ হলেন। পুরস্কার হিসেবে মেডালিয়নের সাথে এক ব্যাগ স্বর্ণমুদ্রাও দিলেন। প্রিন্স ছিলেন অত্যন্ত মহানুভব আর ভাল মানুষ।

এবার আমরা ভোজনকক্ষে গেলাম। শেখ ইয়াজিদ খাবারের চমৎকার আয়োজন করেছেন। বেরেমিজের খ্যাতি একটু একটু করে ক্রমেই বাড়ছে। বোঝাই যাচ্ছে, তিনি এক উঁচু অবস্থানে পৌঁছতে যাচ্ছেন। যা হয়ত ছোটবেলায় কল্পনাও করেননি।

কোনো কোনো অতিথি হতাশা আড়ালের ব্যর্থচেষ্টা করলেন। আমার ব্যাপারটা অপ্রাসঙ্গিক।

২০

দশের ক্ষমতা



গণিতের দ্বিতীয় পাঠ দিলেন বেরেমিজ। সংখ্যা ও সংখ্যার ধারণা। চিত্র। সংখ্যাপদ্ধতি। দশমিক সংখ্যা। শূন্য। আমরা আবারও অদৃশ্য ছাত্রীর সুকোমল কণ্ঠ শুনলাম। ব্যাকরণবিদ দোরেইদ একটি কবিতার অংশ শোনালেন।

ভোজ শেষ। শেখ ইয়াজিদের ইঙ্গিত পেয়ে গণনাকারী উঠে দাঁড়ালেন। গণিতের দ্বিতীয় পাঠের সময় হয়েছে। অদৃশ্য ছাত্রী শিক্ষকের জন্যে অপেক্ষা করছে।

প্রিন্স ও শেখদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন বেরেমিজ। একজন দাস পথ দেখিয়ে তাকে আলাদা করে রাখা পড়ানোর কক্ষের দিকে নিয়ে গেল। আমিও উঠে তার সাথে গেলাম। বেরেমিজ তেলাসসিমকে যা পড়াবেন সেটা দেখার পূর্ণ অনুমতি রয়েছে আমার।

দোরেইদ নামে একজন অতিথিও যাবার আগ্রহ দেখালেন। তিনি একজন ব্যাকরণবিদ। প্রিন্সের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তিনিও চললেন। মানুষটা মধ্যবয়সী। চেহারায় খুশী ও অভিব্যক্তির প্রকাশ স্পষ্ট।

ইরানি গালিচা বিছানো অভিজাত গ্যালারি পার হয়ে এলাম আমরা। অপরুপ সুদর্শন এক সার্কাশীয় দাস আমাদেরকে নিয়ে চলল। আমরা পাঠকক্ষে পৌঁছলাম। এর আগের দিন তেলাসসিমকে আড়াল করে রেখেছিল ছিল লাল পর্দা। আজ সেখানে নীল পর্দা। পর্দার মধ্যখানে একটি তারকাসদৃশ সপ্তভুজ আঁকা।

ব্যাকরণবিদ দোরেইদ ও আমি কক্ষের এক কোণায় বসলাম। আমাদের পাশেই খোলা জানালা দিয়ে বাগান দেখা যাচ্ছে। আগেরবারের মতোই বেরেমিজ কক্ষের মধ্যখানে একটি বড় রেশমের কুশনে বসলেন। তার পাশেই একটি আবলুস কাঠের টেবিলে এক কপি কুরআন রাখা। সার্কাশীয় দাস ও আরেকজন ইরানি দরজার বাইরে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে। তেলাসসিমের ব্যক্তিগত রক্ষী মিশরীয় দাস দাঁড়িয়ে আছে এক পিলারের হেলান দিয়ে।

হালকা প্রার্থনা দিয়ে বেরেমিজ শুরু করলেন।

“আমরা জানি না সংখ্যার সূচনা কীভাবে হয়েছে। দার্শনিকদের গবেষণা অতীতের মেঘের আড়ালে লুকিয়ে আছে।

“সংখ্যার ক্রমবিকাশ নিয়ে গবেষণাকারীরা দেখিয়েছেন, প্রাচীন কালেও মানুষের বুদ্ধিমত্তার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল, যাকে আমরা বলব সংখ্যা ইন্দ্রিয়। এ বৈশিষ্ট্যের সাহায্যে আমরা কিছু জিনিস দেখে বুঝতে পারি সেগুলোর পরিমাণ বেড়েছে না কমেছে। তার মানে এতে সংখ্যাগত পরিবর্তন হয়েছে কি না।

“সংখ্যা ইন্দ্রিয় আর গুণন ক্ষমতা কিন্তু আলাদা জিনিস। শুধু মানুষেরই বুদ্ধিমত্তা এই সংখ্যা ইন্দ্রিয়টি অর্জন করতে পারে। আর গুণন ক্ষমতা অন্য প্রাণীতেও দেখা যায়। যেমন, কিছু কিছু পাখি বাসায় রেখে যাওয়া ডিম গুণতে পারে। দুই ও তিনের পার্থক্য বলতে পারে। কিছু কিছু ভিমরুল পাঁচ ও দশের পার্থক্য ধরতে পারে।

“উত্তর আফ্রিকার গোত্রীয় মানুষরা রংধনুর সবগুলো রংয়ের নাম জানত। তাদের ভাষায় তারা প্রতিটি রংকে আলাদা আলাদা নাম দিয়েছিল। কিন্তু সেই গোত্রে রংয়ের জন্য কোনো শব্দের অস্তিত্ব ছিল না। আবার কোনো কোনো প্রাচীন ভাষায় এক, দুই, তিন ইত্যাদি সংখ্যার জন্যে শব্দ ছিল। কিন্তু সংখ্যা বোঝানোর জন্যে কোনো শব্দ ছিল না।

“সংখ্যার ধারণা কোত্থেলে এল?”

“বোন, আমরা সেটা জানি না। মরু বেদুইন দেখে, দূরে চলছে এক কাফেলা। উটের দল এগিয়ে আসছে পিঠে মালের বোঝা নিয়ে। কয়টি উট আসছে? প্রশ্নটির উত্তর দিতে হলে সংখ্যা লাগবে। চল্লিশ? নাকি এক শ? উত্তর পেতে হলে বেদুইনকে বিশেষ একটা কিছু করতে হবে। তাকে *গুণতে* হবে। আর গুণতে হলে তাকে প্রতিটি জিনিসকে (উট) নির্দিষ্ট প্রতীকের সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে: এক, দুই, তিন, চার ইত্যাদি। গুণে গুণে একটা ফলাফল বা অন্য কথায় একটি সংখ্যা পেতে হলে বেদুইনকে একটি সংখ্যাপদ্ধতি আবিষ্কার করতে হবে।“

“সবচেয়ে প্রাচীন সংখ্যাপদ্ধতির নাম কুইনারি বা পাঁচভিত্তিক সংখ্যাপদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে সংখ্যাদেরকে পাঁচটি পাঁচটি করে গুচ্ছ করা হয়। প্রতিটি গুচ্ছের নাম এক কুইন (quine)। আট একক মানে হলো এক কুইন যোগ ৩। লিখলে হয় ১৩।[[1]](#footnote-1)১

“এখানে বলে রাখি, এই পদ্ধতিতে বামের সংখ্যাটি একে ডানে বসালে যা হত তার পাঁচ গুণ। গণিতের ভাষায় বলা হয়, এ সংখ্যাদের ভিত্তি ৫। প্রাচীন কবিতায় এ সংখ্যাদের নমুনা পাওয়া যায়।

“ক্যালডীয়দের সংখ্যাপদ্ধতির ভিত্তি ছিল ৬০। প্রাচীন ব্যাবিলনে ১.৫ লিখে ৬৫ বোঝানো হত।

“এছাড়া অনেকে ২০ ভিত্তিক সংখ্যা ব্যবহার করত। এ পদ্ধতিতে আমাদের ৯০ সংখ্যাটিকে লেখা হয় ৪.১। মানে ৪টি ২০ ও তার সাথে ১০।

“এভাবেই, আমার বোন, এসেছে ১০ ভিত্তিক সংখ্যারা। বড় বড় সংখ্যা নিয়ে কাজ করতে এগুলো অনেক বেশি সুবিধাজনক। এ পদ্ধতির সূচনা হয়েছে দুই হাতের আঙ্গুলের সংখ্যা থেকে। কিছু কিছু জিনিসের কেনাবেচায় ১২ ভিত্তিক সংখ্যার ব্যবহার দেখা যায়। যেমন এক ডজন, অর্ধডজন, দুই ডজন ইত্যাদি। ১০-এর চেয়ে ১২-এর একটি সুবিধা হলো ১২-এর উৎপাদক বেশি।

“১০ ভিত্তিক বা দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি সবাই গ্রহণ করে নিয়েছে এখন। আঙ্গুলে হিসাব করে তোয়ারেগ**[[2]](#footnote-2)** গোত্রের মানুষ থেকে শুরু করে ক্যালকুলেটরে হিসাব করা গণিতবিদ সবাই ১০ দিয়ে গোণে।

মানুষে মানুষে এত বৈচিত্র্যের মাঝে এমন মিল খুব বিস্ময়কর। ভিন্ন ধর্ম, নৈতিক মূল্যবোধ, সরকার, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, দার্শনিক কাঠামো, ভাষা বা বর্ণমালার মধ্যে এমন মিল পাওয়া যায় না। গণনা সেই নগণ্য জিনিসগুলোর একটি যেখানে মানুষ একমত হতে পেরেছে। এটাকেই তারা সরল ও স্বাভাবিক মনে করে।

“বোন, আমরা লক্ষ করলেই দেখব, বর্বর গোত্র থেকে শুরু করে বাচ্চারা পর্যন্ত আঙ্গুল দিয়ে হিসাব করতে অভ্যস্ত। দশ আঙ্গুল দিয়ে ১০-এর গুচ্ছ দিয়ে হিসেব করতে শুরু করি। আমাদের পুরো পদ্ধতিটাই ১০-এর গুচ্ছ দিয়ে তৈরি।

“খুব সম্ভব রাখালদেরকে ভেড়ার সংখ্যা নিশ্চিত করার জন্যে ১০-এর বেশি গুণতে হত। এক একটি ভেড়া পার হলে রাখাল আঙ্গুলে হিসেব রাখত। প্রতি ১০টি শেষ হলে সে একটি পাথর জমা করত। গোণা শেষ হলে পাথরের সংখ্যা বলে দিত কয়টি ১০-এর গুচ্ছ হয়েছে। মানে ভেড়ার সংখ্যা কত এর ১০ গুণ। পরের দিনও পাথর দেখে সে সংখ্যাটা মনে করতে পারত। পরে আরও বুদ্ধিমান কেউ দেখল একই পদ্ধতিতে ফল, গম, দূরত্ব ও নক্ষত্রের সংখ্যা গোণা যায়। পরে পাথরের বদলে এল স্বতন্ত্র ও টেকসই প্রতীক। সংখ্যার লিখিত রূপের জন্ম হলো।

“কথ্য ভাষায় সব মানুষ দশমিক পদ্ধতি ব্যবহার করত। অন্য পদ্ধতি সবাই ভুলে গেল। কিন্তু পদ্ধতিটা কথ্য থেকে লিখিত সংখ্যায় রূপ নিয়েছে ধীরে ধীরে। সংখ্যাকে লেখার সমস্যার সমাধান করতে মানুষের কয়েক শ বছর সময় লেগেছে। সংখ্যার প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করার জন্যে মানুষকে নকশা বা সাইফার (cipher) নামক বিশেষ কিছু অক্ষরের কথা ভাবতে হয়েছে। যাদের প্রতিটি দ্বারা এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট বা নয় বোঝানো হত। d, c, m ইত্যাদি অন্যান্য অতিরিক্ত অক্ষর দিয়ে দশ, এক শ, এক হাজার ইত্যাদি বোঝানো হত। প্রাচীনকালের গণিতবিদ তাই ৯,৭৬৫ লিখতে হলে লিখতেন 9m7c6d5। প্রাচীনকালের সবচেয়ে পরিশ্রমী ব্যবসায়ী ফিনিশীয়রা অক্ষরে বদলে প্রস্বন চিহ্ন ব্যবহার করত: 9″′ 7′′ 6′ 5।

“গ্রিকরা শুরুতে এই পদ্ধতিটা ব্যবহার করেনি। তারা বর্ণমালার প্রতিটি অক্ষরকে সংখ্যামান প্রদান করেছিল। প্রথম অক্ষর আলফা (α) ১, দ্বিতীয় ক্ষর বিটা (β) ২, তৃতীয় অক্ষর গামা (Γ) ৩ ইত্যাদি। এভাবে ১৯ পর্যন্ত। ছয় ছিল ব্যতিক্রমী। এর ছিল নিজস্ব প্রতীক সিগমা। অক্ষরগুলোকে জোড়ায় জোড়ায় সন্নিবেশিত করা হত: ২০, ২২, ইত্যাদি।

“গ্রিক পদ্ধতিতে ৪,০৪৪ সংখ্যাটিকে দুইটি নকশা দিয়ে বোঝানো হত। ২,০২২ এর জন্য তিনটি। আর ৩,৩৩৩কে প্রকাশ করতে চারটি আলাদা নকশা লাগত।

“রোমানরা কল্পনাশক্তি কাজে লাগিয়েছে আরও কম। তারা I, V ও X অক্ষর তিনটি দিয়ে প্রথম দশটি সংখ্যা বানিয়েছে। পরে আরও ব্যবহার করেছে L (৫০), C (১০০), D (৫০০) ও M (১,০০০)। রোমান প্রতীকে লেখা সংখ্যাগুলো অদ্ভুত রকম জটিল। সাধারণ হিসাব-নিকাশের এগুলো এগুলো সবচেয়ে অসুবিধাজনক ছিল। ছোটখাট হিসাব করতে গেলেও মারাত্মক মুশকিলে পড়তে হত। যোগ করা যেত। কিন্তু একটি সংখ্যাকে আরেকটির নিচে এমনভাবে লিখতে হত যাতে একই রকম প্রান্তীয় অক্ষরগুলোকে একই কলামে লিখতে হত। ফলে প্রতীকে মাঝে ফাঁকা জায়গা রাখা লাগত।

“চার শ বছর আগ পর্যন্ত সংখ্যা বিজ্ঞান এতটুকুই ছিল। এরপর একজন নাম না জানা হিন্দু শূন্য নামক বিশেষ একটি চিহ্নের কথা ভাবলেন। লিখিত সংখ্যাগুলোয় দশমিক সংখ্যার ফাঁকা জায়গায় বসবে সেটি। এই একটি চিহ্ন এসে বিশেষ চিহ্ন, অক্ষর ও প্রস্বন সবকিছুকে অপ্রয়োজনীয় বানিয়ে দিল। থাকল শুধু নয়টি সংখ্যা ও শূন্য। শূন্যের প্রথম বড় অলৌকিক কাজই হলো এই দশটি অক্ষর দিয়েই সবগুলো সংখ্যার লিখতে পারা।

“আরব জ্যামিতিকরা হিন্দুদের উদ্ভাবন গ্রহণ করলেন। তারা খেয়াল করলেন, শূন্যকে কোনো সংখ্যার ডানে বসালে সংখ্যাটি উচ্চতর দশমিক ক্রমে চলে যায়। তারা শূন্যকে একটি যন্ত্রে পরিণত করল।“

“বিজ্ঞানের দীর্ঘ ও উজ্জ্বল পথ পাড়ি দিচ্ছি আমরা। আমাদেরকে বিজ্ঞ কবি ও জ্যোতির্বিদ ওমর খৈয়ামের উপদেশ মনে রাখতে হবে। তিনি শিখিয়েছেন:

তোমার জ্ঞান যেন প্রতিবেশীর কষ্টের কারণ না হয়। নিজের ওপর নজর রাখো। কখনও ক্রোধের কাছে হার মেনো না। তুমি যদি শান্তি চাও, তাহলে সে পথে যে আঘাত পাবে তাও হাসি মুখে বরণ করো। কারও ক্ষতি করো না।

“বিখ্যাত এই কবির কথার মাধ্যমে আমি সংখ্যার সূচনা নিয়ে মন্তব্য এখানেই শেষ করছি। ইনশাআল্লাহ পরবর্তীতে আমরা সংখ্যার প্রধান প্রধান অপারেশনগুলো দেখব। দেখব অন্যান্য বৈশিষ্ট্যও।“

বেরেমিজ নীরব হলেন। ক্লাস শেষ হলো।

হে প্রভু, আমাকে ফলপ্রসূ ও হিতকর কিছু করার তৌফিক দাও

আমি যেন দরিদ্রকে ঘৃণা না করি, অথবা নাই অহঙ্কারী

আমার আত্মাকে জাগতিক তুচ্ছ বিষয়ের উর্ধ্বে নিয়ে যাও

আমাকে তৌফিক দাও তোমার ভালবাসায় সিজদা দেওয়ার

আমি তো আকাশের বুকে ভেসে বেড়ানো এক খণ্ড অনর্থক মেঘ

হে সূর্য, মনে চাইলে আমার শূন্যতাকে গ্রহণ করো, একে হাজার রঙে রঙিন করো, সোনালী আলো হিসেবে বিকীর্ণ করো, বাতাসে দোলাও, ছড়িয়েও দাও পুরো আকাশে। বয়ে দাও বিস্ময়রাশি…

তারপর, তোমার মন চাইলে রাতের অন্ধকার দিয়ে এই খেলা শেষ করো। আমি লুকিয়ে যাব, মিলিয়ে যাব অন্ধকারে, কিংবা ভোরের হাসিতে, স্বচ্ছ পবিত্রতার সজীবতায়।

“অপূর্ব!” ব্যাকরণবিদ দোরেইদ কাঁপা কণ্ঠে বলে উঠলেন।

“হ্যাঁ,” আমি তাকে বললাম, “জ্যামিতি আসলেই দারুণ।“

“আমি জ্যামিতি বোঝাইনি।“ তিনি প্রতিবাদ করলেন। “আমি এখানে সংখ্যা ও প্রতীকের অন্তহীন গল্প শুনতে আসিনি। তাতে আমার কোনো আগ্রহ নেই। আমি বলতে চেয়েছি, তেলাসসিমের কণ্ঠ অসাধারণ…“

আমি অবাক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে ছিলাম। তাকে বোকা বোকা লাগছে। দুষ্ট কণ্ঠে সে বলল, “আমি আশা করেছিলাম, ক্লাসের সময় মেয়েটা তার চেহারা দেখাবে। শুনেছি সে নাকি রমজানের চতুর্থ চাঁদের মতো সুন্দরী। ইসলামের প্রকৃত এক ফুল।“

সে উঠে দাঁড়িয়ে নীচু স্বরে গাইল:

তুমি যদি অলস হও বা অযত্নে বেড়ে উঠো, কলস ভাসিয়ে দাও পানিতে, তবে এসো, এসো আমার কাছে

পাহাড়ের ঘাস সবুজ হয়ে উঠছে, বনের ফুলেরা বিকশিত হচ্ছে

পাখির যেভাবে নীড় ছেড়ে যায় তেমনি তোমার চিন্তা পালাবে কালো নয়ন ছেড়ে, তোমার নিকাব পড়বে তোমার পায়ের গোড়ায়।

এসো, এসো আমার কাছে।

আমরা একটু বিরক্ত হয়ে আলোকিত কক্ষ থেকে চলে এলাম। খেয়াল করলাম, সরাইখানায় আসার দিন বেরেমিজ যে আংটিটা পেয়েছে সেটা তার আঙ্গুলে নেই। তিনি সুন্দর সেই অলঙ্কারটি হারিয়ে ফেলেছেন?

সার্কাশীয় দাস সতর্ক নজর রাখছিল। মনে হয় যেন মেয়েটিকে বুঝি কোনো অদৃশ্য জিন আক্রমণ করবে।

২১

দেয়ালের লিখন



আমি চিকিৎসাবিজ্ঞানের বই অনুলিপি করার কাজ শুরু করলাম। অদৃশ্য ছাত্রীর পড়াশোনায় ব্যাপক অগ্রগতি হলো। জটিল এক সমস্যার সমাধানের জন্য বেরেমিজের ডাক পড়ল। রাজা মাজিম ও খোরাসানের কারাগার। চোরাকারবারি সানাদিক। একটি কবিতা, একটি সমস্যা ও একটি কিংবদন্তি। রাজা মাজিমের রায়।

খলিফার শহরে আমাদের জীবন ক্রমেই ব্যস্ত হয়ে উঠতে লাগল। উজির মালুফ সাহেব আমাকে দার্শনিক রাজেসের দুটি বইয়ের অনুলিপি করতে দিলেন। বই দুটিতে চিকিৎসাবিদ্যার প্রচুর জ্ঞান আছে। এগুলো থেকে আমি আরক্ত জ্বরের (scarlet fever) চিকিৎসা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানলাম। জানলাম শৈশবের কিছু রোগের ব্যাপারে। কিডনির রোগের কথা ও মানুষের অন্যান্য হাজারো রোগের কথা পড়লাম। এ কাজে ব্যস্ত থাকায় শেখ ইয়াজিদের প্রাসাদে বেরেমিজের ক্লাসে যেতে পারছিলাম না।

একদিন শেষ বিকেল। আমরা আমাদের সাধারণ খাবার খেতে বসেছি। মাংসের বড়া, মধু ও জলপাই। এ সময় ঘোড়ার উচ্চশব্দ ও হৈচৈ শুনলাম। তুর্কি সৈন্যদের আদেশ ও শপথ শোনা যাচ্ছে। আমি চমকে উঠে দাঁড়ালাম। হচ্ছেটা কী? আমার মনে হলো, সরাইখানা সৈন্যরা ঘিরে রেখেছে। হয়ত বদমেজাজি পুলিশপ্রধান সহিংস কোনো কাজ করে বসতে পারে।

হঠাৎ এই উত্তেজনা বেরেমিজকে একটুও প্রভাবিত করল না। ঘটনার দিকে তাঁর কোনো মনোযোগই নেই। কার্বন স্টিক দিয়ে কাঠের টেবিলে তিনি জ্যামিতিক চিত্র এঁকে যাচ্ছেন। কত অসাধারণ! হঠাৎ করে মৃত্যুর ফেরেশতা আজরাইল চলে এলেও হয়ত তিনি আপনমনে রেখা ও কোণ আঁকতে থাকবেন। বের করতে থাকবেন সংখ্যা ও নকশার বৈশিষ্ট্য।

সরাইখানার ছোট্ট কক্ষে বৃদ্ধ সালিম প্রবেশ করলেন। সাথে দুজন দাস ও একজন উট চালক। সবাই উত্তেজিত। যেন কোনো এক মহা ঘটনা ঘটে গেছে।

“আল্লাহর দোহাই,” আমি অস্থির হয়ে বলে উঠলাম, “বেরেমিজকে বিরক্ত করো না। এত গোলমাল কিসের? বাগদাদে কি কোনো বিদ্রোহ হয়েছে? সুলাইমান মসজিদ কি ধ্বংস হয়ে গেছে?

“তুর্কি সেনাদের এক দল রক্ষী এসেছে।“ সালিম বলল।

“কিন্তু কেন?”

“এরা হলেন উজির মালুফের রক্ষী। এক্ষুণি বেরেমিজকে তাঁর কাছে নিয়ে যেতে তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।“

“কিন্তু তাই বলে এত হৈচৈ করতে হবে?” আমি বললাম। “আমাদের বন্ধু ও অভিভাবক উজির সাহেব সেটা করতেই পারেন। এ তো খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। আমাদের বিজ্ঞ বন্ধুকে হয়ত জরুরি কোনো গাণিতিক সমস্যা সমাধান করতে হবে।“

বেরেমিজের হিসাবের মতোই আমার অনুমান সঠিক হলো। একটু পরেই রক্ষীদের নিরাপত্তায় আমরা উজির মালুফের প্রাসাদে পৌঁছলাম।

উজিরকে তাঁর অভ্যর্থনা কক্ষে পাওয়া গেল। পাশে তিন সহকারী। উজিরের জাতে সংখ্যা ও হিসাব-নিকাশের একটি কাগজ। আমি ভাবছি কী এমন সমস্যা খলিফার বিজ্ঞ উজিরকে এমন মুশকিলে ফেলে দিল?’

“মারাত্মক এক সমস্যায় পড়েছি।“ উজির বললেন বেরেমিজকে। “আমার জীবনে এমন সমস্যায় খুব কমই পড়েছি। সমস্যা কীভাবে হলো বলছি। শুধু তুমিই এর সমাধান দিতে পারো।“

এরপর উজির শোনালেন সে সমস্যা:

“গত পরশুর কথা। খলিফা তিন সপ্তাহের জন্যে বসরার দিকে রওয়ানা দিচ্ছিলেন। এমন সময় কারাগারে ভয়াবহ আগুন লেগে যায়। কারাকক্ষে আবদ্ধ কয়েদীরা অনেক কষ্টভোগ করে। আমাদের মহানুভব খলিফা সাথে সাথে সিদ্ধান্ত নিলেন, সব কয়েদীর সাজা অর্ধেক করে দিবেন। শুরুতে এ নিয়ে আমরা খুব বেশি ভাবিনি। খলিফার নির্দেশ পালন করা বেশ সহজই মনে হয়েছিল। পরের দিন আমরা লক্ষ করলাম তিনি রওয়ানা দেবার সময়ে যে নির্দেশ দিয়ে গেছেন তাতে একটি সমস্যা আছে। যার কোনো ভাল সমাধান পাওয়া যাচ্ছে না। তবে আমাদের এটা বুঝতে বুঝতে খলিফা বহু দূরে চলে গেছেন।

“কয়েদীদের মধ্যে সানাদিক নামে বসরার একজন চোরাকারবারিও আছে। সে ইতোমধ্যে যাবজ্জীবন সাজার চার বছর পূর্ণ করেছে। তার সাজাও অর্ধেক করতে হবে। কিন্তু তারা সাজা তো মৃত্যু পর্যন্ত। এখন নিয়মানুসারে তারা সাজা হবে তার বাকি জীবনের অর্ধেক। কিন্তু সে কখন মারা যাবে তা তো কেউ জানে না। তাহলে তারা সাজার মেয়াদ কীভাবে ঠিক হবে?

বেরেমিজ একটু ভাবলেন। কথা গুছিয়ে নিয়ে বললেন:

“সমস্যাটা খুব নাজুক। এতে একইসাথে গণিত ও আইনের ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে। এটা যতটা না সংখ্যাগত ব্যাপার ততটাই বিচারিক বিষয়। এর ভাল ব্যাখ্যা দিতে হলে আমাকে সাজাপ্রাপ্ত সানাদিকের কারাকক্ষ দেখতে হবে। এমনও হতে পারে সানাদিকের নিয়তি তার অজানা আয়ুষ্কাল কক্ষের দেয়ালেই লিখেই রেখেছে।

“আপনি যা বলছেন তা তো খুবই অদ্ভুত শোনাচ্ছে।“ উজির মন্তব্য বললেন। “পাগল ও বন্দীরা কারাকক্ষের দেয়ালে কী লিখে রাখে তার সাথে নাজুক সমস্যার কোনো সম্পর্ক তো আমি দেখছি না।“

“জনাব!” বেরেমিজ বললেন, “কারাগারের দেয়ালে অনেক মজার মজার লেখা, সূত্র, পঙতি ও খোদাই পাওয়া যায়, যেগুলো মানুষের অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ। যেগুলো দেখে হয়ত আমাদের মধ্যে করুণার উদ্রেক হয়। একবার সমৃদ্ধশালী খোরাসান প্রদেশের শাসক মাজিমের সাথে একবার এমন হয়েছিল। তাঁকে বলা হলো একজন বন্দী দেয়ালে কিছু জাদুকরী কথা লিখেছে। রাজা মাজিম একজন দক্ষ লেখককে ডাকলেন। ধূসর দেয়ালে যত অক্ষর, সংখ্যা, পঙতি ও অন্যান্য লেখা পাওয়া যায় সব লিখে আনতে বললেন। রাজার অদ্ভুত নির্দেশ বাস্তবায়ন করতে কয়েক সপ্তাহ লাগল। অসামান্য ধৈর্য্যের পরে তিনি রাজার সামনে লেখায় ভর্তি কাগজ নিয়ে হাজির হলেন। তাতে রয়েছে প্রতীক, দুর্বোধ্য কথা, অর্থহীন আঁকিবুঁকি, রাজদ্রোহী কথা ও অনর্থক সংখ্যা। কাগজের এসব দুর্বোধ্য লেখার মর্ম উদ্ধার বা অনুবাদ করার কি কোনো উপায় আছে? রাজা একজন পণ্ডিতকে ডেকে আনলেন তবু। আর তিনি বললেন, “মহামান্য রাজা, এগুলোতে অভিশাপ, দ্রোহ, কঠিন তত্ত্ব, রূপকথা লেখা আছে। আছে একটি গাণিতিক সমস্যাও।“

রাজা বললেন, “অভিশাপ বা দ্রোহে আমার আগ্রহ নেই। কঠিন তত্ত্বের প্রতিও আমি উদাসীন। মানুষের প্রতিকৃতি দিয়ে বানানো রহস্য বা অক্ষরের গোপন ক্ষমতায় আমি বিশ্বাসী নই। তবে কবিতা ও রূপকথা আমার ভাল লাগে। কারণ এসব মহান কথায় মানুষ স্বস্তি খুঁজে পায়। অজ্ঞরা পায় শিক্ষা। আর ক্ষমতাশালীরা পায় সতর্কবাণী।

“ ‘দণ্ডিত ব্যক্তির হতাশা থেকে আর কী অনুপ্রেরণা পাওয়া যাবে?’ বললেন বিজ্ঞ পণ্ডিত।

“ ‘তবুও আমি লেখাগুলো দেখতে চাই।‘ জবাব দিলেন রাজা।

“পণ্ডিত ব্যক্তি তখন একটি কাগজ তুললেন। এতে লেখা ছিল:

‘সুখে থাকা কঠিন, কারণ আমাদের কাছে তার উপাদানগুলো নেই।

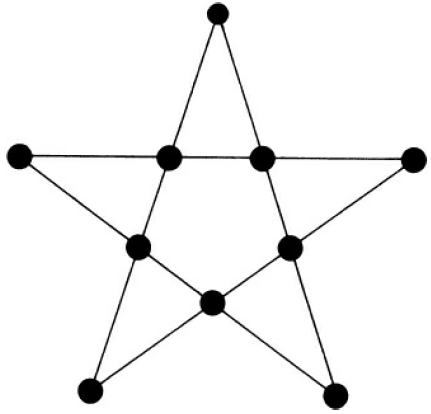
দুর্ভাগাদের কাছে সুখের কথা বলো না।

যখন ভালাবাসার জিনিস পাওয়া যায় না, তখন পাওয়া জিনিসকেই ভালবাসতে হয়।‘

“রাজা নীরব হয়ে গেলেন। মনে হলে ভাবনার সাগরে ডুবে গিয়েছেন। তাঁকে বাস্তবে ফিরিয়ে আনতে পণ্ডিত ব্যক্তি বললেন, ‘দণ্ডিতের কক্ষের দেয়ালে এই সমস্যাটি লেখা ছিল:

দশজন সৈনিককে পাঁচটি সারিতে সাজান, যাতে প্রত্যেক সারিতে চারজন সৈনিক থাকে।‘

“সমস্যাটাকে দেখে সমাধানের অযোগ্য মনে হয়। কিন্তু সমাধান খুব সহজ। চিত্র দেখলেই বোঝা যায়। এখানে পাঁচটি সারি আছে, যার প্রত্যেকটি আছে চারজন সৈনিক।



“তিনি আরও পড়ে গেলেন:

একদিন তরুণ চু-চাং মহান কনফুসিয়াসকে প্রশ্ন করলেন, ‘হে মহান জ্ঞানী, রায় দেওয়ার আগে জজকে কয়বার ভাবা উচিত?’

‘আজ একবার, আগামীকাল দশ বার।‘ কনফুসিয়াস উত্তর দিলেন।

প্রিন্স চু-চাং এ শুনে অবাক হলেন। বুঝলেন না এর মানে।

‘কাউকে ক্ষমা করে দেওয়ার জন্যে,’ বিজ্ঞ কনফুসিয়াস শান্তভাবে জবাব দিলেন, ‘একবার ভাবাই যথেষ্ট। তবে কাউকে সাজা দেওয়ার আগে জজকে দশবার ভাবতে হবে।‘

এরপর তিনি বললেন মহামূল্যবান এই কথাটি: ‘যে ক্ষমা করতে দ্বিধা সে মস্ত ভুল করছে। আর শাস্তি দিতে দ্বিধা করে না সে আল্লাহর চোখে আরও অনেক বড় ভুল করছে।‘

“কারাগারে এমন নোংরা কক্ষে বন্দীর হাতের লেখা এমন সুন্দর ও আগ্রহোদ্দীপক অমূল্য বাণী পেয়ে রাজা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন।

“অবশ্যই কারাগারের চার দেয়ালের মধ্যে কষ্টের দিন পার করা বন্দীদের মধ্যেও জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান মানুষ রয়েছেন। রাজা সব সাজা আবার যাছাই-বাছাই করার নির্দেশ দিলেন। দেখা গেল, অনেকেই অবিচারের স্বীকার হয়েছিলেন। লেখকের প্রাপ্ত তথ্যমতে অনেক নিরপরাধ বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হলো। অনেক বিচারিক ভুল সংশোধন করা হলো।

“তবে তাই হোক।“ উজির মালুফ বললেন। “তবে বাগদাদের কারাগারে আপনি জ্যামিতিক চিত্র, রূপকথা বা কবিতা পাবেন না। তবুও আমি দেখতে চাই আপনার অনুসন্ধান থেকে কী পাওয়া যায়। কারাগার থেকে ঘুরে আসুন তাহলে।

২২

অর্ধেক ও অর্ধেক



বাগদাদের কারাগার পরিদর্শনে গিয়ে যা দেখলাম। সানাদিকের যাবজ্জীবন সাজা অর্ধেক কমানোর সমস্যা বেরেমিজ যেভাবে সমাধান করলেন। সময়ের মুহূর্ত। শর্তাধীন স্বাধীনতা। বেরেমিজ সাজার ভিত্তি ব্যাখ্যা করলেন।

বাগদাদের বিশাল কারাগারকে চীন বা পারস্যের দূর্গের মতো মনে হলো। শুরুতেই আমরা ছোট একটি উঠোন পেরোলাম। উঠোনের মধ্যখানে বিখ্যাত সেই আশার কূপ। এখানে একজন মানুষ তার সাজার রায় শুনে সব আশা হারিয়ে ফেলে। এমন জাঁকজমকপূর্ণ আরব শহরটির ভেতরের এই অন্ধকার ভূগর্ভের কারাকক্ষের বন্দীদের কষ্ট ও দূর্ভোগ কারও পক্ষেই কল্পনা করা সম্ভব নয়।

সানাদিকের কক্ষ কারাগারের একদম ভেতরের দিকে। একজন কারারক্ষক ও দুজন প্রহরীকে নিয়ে আমরা তার কক্ষের দিকে চললাম। একজন দীর্ঘদেহী সুদানী দাসের হাতে টর্চলাইট। সে আলোয় কারাগের কুলুঙ্গি আলোকিত হয়ে পথ দেখাচ্ছে আমাদের।

সঙ্কীর্ণ এক বারান্দা পেরোলাম আমরা। একজন মানুষ পার হতেই কষ্ট হয়। নামলাম অন্ধকার ও স্যাঁতসেঁতে এক সিঁড়িতে আমরা। ভূগর্ভের একদম গভীরে সানাদিকের বন্ধ কক্ষ। আলোর রেশমাত্র নেই। পূতিগন্ধময় ভারী বাতাসে বমি চলে আসতে চায়। মেঝেতে কাদার আবরণ পড়ে আছে। চার দেয়ালের ভেতরের কক্ষটিতে শোয়ার জন্যও নেই কিছু।

সুদানী দাসের টর্চের আলোতে হতভাগা সানাদিককে দেখতে পেলাম। গায়ে প্রায় কিছুই নেই। দাঁড়িতে জট। লম্বা চুল কাঁধ পর্যন্ত নেমে এসেছে। মানুষটা বসে আছে পাথরের একটি চৌকিতে। হাত ও পা লোহার শিকল দিয়ে বাঁধা।

বেরেমিজ মনোযোগ দিয়ে নীরবে তাকে দেখল। মানুষটা চার চারটি বছর এমন হতভাগ্য ও অমানবিক জীবনযাপন করেছে বিশ্বাস করতেই কষ্ট হয়।

কক্ষের দেয়ালের রং উঠে গেছে। পলেস্তারা খসা। তাও দেয়ালে লেখা ও ছবি দেখা যাচ্ছে। বিভিন্ন সময়ের কয়েদীদের আঁকা অদ্ভুত সব চিহ্ন। বেরেমিজ সেগুলো নিবিড়ভাবে পরীক্ষা করে দেখলেন। গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়ছেন ও অনুবাদ করছেন। মাঝেমধ্যেই থেমে বড় ও কঠিন হিসাব করছেন। এসব অভিশাপ ও রাষ্টদ্রোহ দেখে গণনাকারী কীভাবে বুঝবেন লোকটি আর কতদিন বাঁচবে?

হতভাগা বন্দীদেরকে নির্যাতনের এই ভয়ানক বন্দীশালা থেকে বের হয়ে অপরিসীম স্বস্তি পেলাম। জমকালো অভ্যর্থনাকক্ষে পৌঁছতেই উজির মালুফ আসলেন। সাথে অমাত্য, সচিব, কয়েকজন শেখ ও দরবারী পণ্ডিতরা। সবাই বেরেমিজের জন্যে অপেক্ষা করছেন। সবাই জানতে ইচ্ছুক কীভাবে গণনাকারী যাবজ্জীবন সমস্যার সমাধান করেন।

“আমরা আপনার জন্যে অপেক্ষা করছি,” উজির খুব অমায়িকভাবে বললেন। “আর দেরি না করে আমাদেরকে একটি সমাধান দিন দয়া করে। আমি যেভাবে বলবেন সেভাবেই হবে।“

বেরেমিজ শ্রদ্ধাভরে সালাম দিলেন সবাইকে। এরপর বললেন:

“বসরার চোরাকারবারি সানাদিককে চার বছর আগে গ্রেপ্তার করে যাবজ্জীবন সাজা দেওয়া হয়েছিল। আমাদের দয়ালু ও মহানুভব খলিফা, বিশ্বাসীদের শাসক, একটু আগেই সে সাজাকে অর্ধেক করেছেন।

“ধরুন সানাদিক সাজা পাওয়ার পর যতদিন বাঁচবে সেটুকু সময়ের পরিমান ‘ক’। তাকে যাবজ্জীবন বা ‘ক’ বছরের সাজা দেওয়া হয়েছে। এখন রাজ আদেশে সে সাজা হবে অর্ধেক। এখন ‘ক’-কে আলাদা আলাদা সময়কালে ভাগ করলে খেয়াল রাখতে হবে যেন জেলে ও বাইরে সমান সময় কাটে।

“একদম ঠিক বলেছেন। আমি যুক্তি শুনছি।“ উজির বললেন।

“এখন, সানাদিক ইতোমধ্যে চার বছর জেলে কাটিয়েছেন। মনে হচ্ছে তাকে এবার চার বছরের জন্যে মুক্তি দেওয়া যায়। ধরুন, কোনো ভবিষ্যতকথক জানেন লোকটি আর কতদিন বাঁচবে। ধরুন তাকে সাজা দেওয়ার সময় জানা গেল, তার জীবনের আট বছর বাকি আছে। তাহলে ‘ক’-এর মান হত আট। আর এখন সে আটের পরিবর্তির সাজা হবে চার বছর। কিন্তু সে ইতোমধ্যে চারবছর সাজাভোগ করে ফেলেছে। অতএব এখন সে মুক্ত হবে। আর সে যদি আট বছরের বেশি বাঁচত তাহলে তার জীবনকে তিন ভাগে ভাগ করতে হত। একটি ভাগ হলো তার জেলে কাটানো সময়। আরেকটি ভাগ তার মুক্তির চার বছর। আর বাকি ভাগকেও দুই ভাগে ভাগ করতে হবে। কারাভোগ ও মুক্তি। সহজেই বোঝা যাচ্ছে, ‘ক’-এর মান যাই হোক, আইন অনুসারে তাকে এখনই মুক্ত করে দিতে হবে। চার বছরে জন্য মুক্তি দিতে হবে। এই সময়টুকুয় মুক্তি পাওয়ার তার সম্পূর্ণ অধিকার রয়েছে।

“এই সময়টা পার হলে তাকে আবার জেলে ফিরে আসতে হবে। থাকতে হবে তার বাকি জীবনের অর্ধেক সময়। খলিফার নির্দেশ পালনের সবচেয়ে সহজ উপায় হতে পারে তাকে এক বছর জেলে রাখা ও পরের এক বছর মুক্ত রাখা। তবে এমন একটি সমাধান নিখুঁত হবে যদি সাজাপ্রাপ্ত লোকটি তার মুক্তির মেয়াদের একদম শেষ দিন মারা যায়।

“ধরুন, সানাদিক এক বছর জেলে কাটাল। এরপর মুক্ত হয়ে চার মাসের মাথায় মারা গেল। এক্ষেত্রে সে জেলে থাকল এক বছর, কিন্তু মুক্ত থাকল চার মাস। এটা কিন্তু সঠিক হলো না। সাজা অর্ধেক হলো না।

“তাকে এক মাস জেলে রেখে পরের এক মাস মুক্ত রাখলে হয়ত ব্যাপারটা আরও সরল হবে। কিন্তু তাতেও একইরকম ভুল হবে। সে তো পরের মাস পূর্ণ হওয়ার আগেই মারা যেতে পারে।

“তাহলে হয়ত মনে হবে একদিন একদিন করে জেল ও মুক্তি দেওয়াই ভাল হবে। যতদিন না সে মারা যায়। তাও গাণিতিকভাবে এ সমাধান সঠিক হবে না। কারণ সানাদিক জেলের দিনের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেও মারা যেতে পারে। এক ঘণ্টা এক ঘণ্টা করেও যদি জেল ও মুক্তি দেওয়া হয় তাহলে সমাধান হবে না। গাণিতিকভাবে ঠিক হতে হলে তাকে মুক্তির মেয়াদের শেষ মিনিটে মারা যেতে হবে। তা না হলে তার সাজার খলিফার নির্দেশ অনুসারে অর্ধেক হবে না।

“সঠিক গাণিতিক সমধান হলো: সানাদিককে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে জেলে রাখতে হবে। তারপর একই পরিমাণ সময়ের জন্যে মুক্তি দিতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে যেন তার জেল ও মুক্তি সময় যাতে এত ছোট হয় যে সেটা অবিভাজ্য হয়।

“বাস্তবে এমন সমাধান অসম্ভব। কীভাবে একজন মানুষ এক মুহূর্ত জেলে ও ঠিক পরের মুহূর্তে মুক্ত করা সম্ভব? এমন বুদ্ধি বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয় বলে মাথা থেকে ফেলে দিতে হবে।

“সম্মানিত উজির, সমস্যাটি সমাধান করার একটাই উপায় দেখতে পাচ্ছি। সানাদিককে আইনের মাধ্যমে শর্তাধীন মুক্তি দেওয়া উচিত। তাকে একইসাথে শাস্তি ও মুক্তি দেওয়ার এটাই একমাত্র উপায়।

উজির সাথে সাথে বেরেমিজের প্রস্তাব বাস্তবায়ন করার নির্দেশ দিলেন। সেদিনই সানাদিককে শর্তাধীন মুক্তি দেওয়া হলো। এরপর থেকে অনেক আরব জজই এ পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন।

পরের দিন আমি বেরেমিজকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি জেলের দেয়াল থেকে কী তথ্য ও হিসাব-নিকাশ বের করতে পেরেছেন। কীভাবেই বা তিনি এমন সৃজনশীল একটি সমাধান দিলেন। তিনি উত্তর দিলেন:

“ভূগর্ভের বিষণ্ণ দেয়ালের অভ্যন্তরে অন্তত কিছু সময় কাটালেই কেবল এমন সমস্যা সমাধান করা সম্ভব। যাতে সংখ্যা মানবিক দুর্দশার একটি চিত্র প্রকাশ করে।“

২৩

সবকিছুই আপেক্ষিক



আমাদের আরেকটি সাক্ষাত। প্রিন্স ক্লুজির শাহের বক্তব্য। প্রিন্সের দাওয়াত। বেরেমিজ আরেকটি সমস্যা সমাধান করলেন। রাজার মুক্তো। একটি দুর্বোধ্য সংখ্যা। আমাদের ভারতে যাওয়া ঠিক হলো।

আমরা যে জেলায় বাস করছি সেখানকার এক সুন্দর সকাল। এমন সময় হঠাৎ প্রিন্স ক্লুজির আসলেন বেরেমিজের কাছে। সাথে বিশাল এক দল সফরসঙ্গী। তাদের দেখতে বাসার ছাদ ও বারান্দায় মানুষ জড় হয়েছে। আবাল-বৃদ্ধা-বনিতা সবাই অবাক বিস্ময়ে হাঁ করে দেখছে সে দৃশ্য। প্রথমে এল দারুণ আরবীয় ঘোড়ায় ত্রিশজন অশ্বারোহী। মখমলের স্বর্ণ-খচিত পোশাকের পাড়ে আছে রূপোর চিহ্ন। মাথায় সাদা পাগড়ি ও শিরস্ত্রাণ। সূর্যের আলোয় তা চিকচিক করছে। গায়ের জোব্বা রেশমের। কোমরের চামড়ার কোষে ঝুলছে খঞ্জর। প্রিন্সের সুরক্ষা হিসেবে তাদের সামনে আছে একটি সাদা হাতি। তাদের পরের অশ্বারোহীরা হলো তীরন্দাজ ও গোয়েন্দা

বহরের পেছনদিকে আছেন রাজপুত্র নিজে। সাথে দুজন সচিব, ডাক্তার ও দশজন রক্ষী। গায়ে অরুণ রংয়ের জোব্বা। তাতে রয়েছে মুক্তোর দানা। পাগড়িতে জ্বলজ্বল করছে নীলকান্তমণি ও চুনিপাথর। সরাইখানা থেকে এমন জাঁকজমপূর্ণ বহর থেকে বৃদ্ধ সালিম প্রায় পাগলপারা। সে চিৎকার করে বলে উঠল, “এ কী দেখছি! কোথায় আমি?” এরপর বেহুশ। পানি ঢালার ব্যবস্থা করে আমি স্বাভাবিক করলাম তাকে।

সরাইখানার প্রধান কক্ষে এত লোকের জায়গা হবার নয়। বেরেমিজ এত মানুষ দেখে অভিভূত। চললেন স্বাগত জানানোর উদ্দেশ্যে।

প্রিন্স ক্লুজির শাহ দলবল নিয়ে প্রবেশ করলেন। গণনাকারীকে উষ্ণকণ্ঠে সালাম দিলেন। বললেন, “একজন দরিদ্র বিজ্ঞ সেই ব্যক্তি যে ধনীকে খুঁজে বেড়ায়। কিন্তু এর চেয়ে মহান ধনী হলো সেই যে বিজ্ঞজনকে খোঁজে।“

“আমি বুঝেছি,“ বললেন বেরেমিজ। “আপনার কথাগুলো গভীর বন্ধুত্বের নিদর্শন। আপনার মহানুভব হৃদয়ের বিপরীতে আমার নগণ্য জ্ঞান কিছুই নয়।“

“বিজ্ঞানের প্রতি ভালবাসার চেয়ে আমার নিজস্ব ইচ্ছা এখানে আসার ব্যাপারে বেশি ভূমিকা রেখেছে।“ প্রিন্স জবাব দিলেন। “শেখ ইয়াজিদের বাসায় আপনার কথা শোনার সম্মানজনক সুযোগ পেয়েই আমি ভেবে রেখেছি আপনাকে আমার দরবারে কোনো উপযুক্ত পদ দেওয়ার প্রস্তাব দেব। আমি আপনাকে আমার সচিব বা আরও ভালই বরং দিল্লীর পর্যবেক্ষণকেন্দ্রের পরিচালক বানাতে চাই। আপনার মত কী? কয়েক সপ্তাহ পরে আমরা মক্কার দিকে যাব। সেখান থেকে সোজা ভারত।“

“মহানুভব প্রিন্স!” বেরেমিজ জবাব দিলেন, “দূর্ভাগ্যের ব্যাপার হলো আমি এখন বাগদাদ ছেড়ে যেতে পারছি না। এ শহরে আমার একটি বড় দায়িত্ব আছে। শেখ ইয়াজিদের মেয়েকে জ্যামিতির সৌন্দর্য না শিখিয়ে এখান থেকে যেতে পারছি না।“

মহারাজা হেসে বললেন, “আপনি সেজন্যেই আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে থাকলে সেটার সমাধান আছে। শেখ ইয়াজিদ আমাকে বলেছেন তাঁর মেয়ে দ্রুতই শিখছে। কিশোরী তেলাসস্মি কয়েক মাসের মধ্যেই পণ্ডিত ব্যক্তিদেরকেও রাজার মুক্তোর সমস্যাও শিখাতে পারবে।

বুঝলাম, মহান অতিথির কথায় বেরেমিজ অবাক হয়েছে। তাকে দেখে একটু বিভ্রান্ত মনে হলো।

“এই কঠিন সমস্যাটি,” প্রিন্স বললেন, “বুঝতে পারলে আমা ভাল লাগবে। অনেক গণনাকারীই সমস্যাটি দ্বারা বিভ্রান্ত হন। আমার এক বিখ্যাত পূর্বপুরুষ প্রথম এই সমস্যাটি লিপিবদ্ধ করেছেন।“

প্রিন্সের ইচ্ছা অনুসারে বেরেমিজ ধীরে-সুস্থে সমস্যাটি নিয়ে কথা বললেন।

“এটা যতটা না সমস্যা তার চেয়ে বেশি হলো গাণিতিক কৌতূহল।“ বললেন তিনি। “ব্যাপারটা হলো এরকম: এক রাজা মৃত্যুর সময় মেয়েদের জন্যে কিছু মুক্তোর দানা রেখে গেলেন। সেগুলো মেয়েদের মধ্যে ভাগ করার জন্যে একটি নয়ম বলে গেলেন: বড় মেয়েকে দিতে হবে একটি মুক্তো ও বাকি মুক্তোগুলো থেকে সাত ভাগের এক ভাগ। দ্বিতীয় মেয়েকে দিতে হবে দুটি মুক্তো ও বাকিগুলোর সাত ভাগের এক ভাগ। তৃতীয়জন পাবে তিনটি মুক্তো ও বাকিগুলোর সাত ভাগের এক ভাগ। বাকিরাও পাবে এভাবে।

1. ১. *পাঁচ ভিত্তিক সংখ্যা বলে এসব সংখ্যায় অঙ্ক ব্যবহার করা যাবে ৫টি। ০ থেকে ৪। অতএব সংখ্যাগুলো হবে ০, ১, ২, ৩, ৪, ১০, ১১, ১২, ১৩। দেখুন ৮ নম্বরে আছে ১৩। তার মানে পাঁচভিত্তিক সংখ্যাপদ্ধতিতে ১৩ এর সাংখ্যিক মান ৮* ~অনুবাদক [↑](#footnote-ref-1)
2. লিবিয়া ও আলজেরিয়ায় বাস করা একটি গোত্র [↑](#footnote-ref-2)